ছেলেটির দুরন্তপনার শেষ নেই।

মাত্র ছ'সাত বছর বয়েস, তবু তাকে নিয়েই বাড়ির সবাই সদাব্যস্ত ও তটস্থ হয়ে থাকে। সে কখন গাছে চড়বে, কখন পুকুরে নেমে দাপাদাপি করবে, সে জন্য সবসময় নজর রাখতে হয় তার ওপর।

সে তো শুধু গাছে চড়ে না, পেয়ারা গাছে উঠে কচি কচি পেয়ারা ছিঁড়ে ঢিলের মতন ছুড়ে মারে লোকের গায়ে। সে সাঁতার জানে, পুকুরে নামলে এমনিতে ভয় নেই, কিন্তু জ্বালাতন করবে অন্য ছেলেমেয়েদের। কারোর পা ধরে টানে, কারোর চুলের মুঠি ধরে মাথাটা ঠেসে রাখে জলের মধ্যে।

নিত্য তিরিশ দিন কেউ না কেউ এসে নালিশ করে মধুর নামে। তাতে কোনও লাভ নেই, যারা নালিশ করে, তারাই বকুনি খায়। মধুর সাত খুন মাপ।

পুকুরটার মধ্যে কচুরিপানা জমে জমে ছোট একটা দ্বীপের মতন হয়ে গেছে। সেখানে সাপখোপের বাসা, ভয়ে কেউ যেতে চায় না, রাত্তিরে ওখান থেকে নাকি একটা পেত্নির

কান্নাও শোনা যায়। মধুর ভয় ডর নেই, সাঁতরে সেই দ্বীপটায় উঠে 'কই সাপ, কই সাপ' বলে নাচে।

মধুকে কেউ শাস্তি দেয় না, কিন্তু তার দস্যিপানায় অতিষ্ঠ হয়ে কেউ যদি কখনও সামান্য একটু রাগ দেখায়, অমনি মধু অভিমান করে পুকুরে ঝাঁপ দিয়ে সাঁতরে চলে যায় সেই সাপখোপের দ্বীপে। সবাইকে ভয় দেখায়। সবচেয়ে বেশি ভয় পান তার মা। তিনি ছুটে আসেন কাঁদতে কাঁদতে।

মধু তার বাবা-মায়ের একমাত্র সন্তান। তার আরও দুটি ভাই জন্মেছিল, দুজনেই বাঁচেনি, তাই মধুকে নিয়ে তার মায়ের সর্বক্ষণ দুশ্চিন্তা। বৃহৎ একান্নবর্তী পরিবারের সবচেয়ে ছোট ছেলে মধু, তাই বাড়ির সবাই তাকে প্রশ্রয়ে আর আদরে ঘিরে রাখে।

কেউ কেউ অবশ্য আড়ালে বলে, এত আদর দিয়ে দিয়ে মধুর মাথাটা খাওয়া হচ্ছে। ভবিষ্যতে ও ছেলে একটা বাঁদর হবে।

একদিন তাকে একজন সামনাসামনি বাঁদর বলে ফেলার জন্য কী কাণ্ডই না হল।

বাড়ির অন্য ছেলেদের মতন মধুকেও ভর্তি করে দেওয়া হয়েছে পাঠশালায়। চণ্ডীমণ্ডপের পাশে এক পাঠশালা, মধুর ঠাকুরদারই তৈরি। তিনিই সব খরচ চালান। একজন পণ্ডিত আনানো হয়েছে বিক্রমপুর থেকে। তাঁর মেজাজটি বড় উগ্র। তাঁর হাতে একটা লিকলিকে বেত থাকে, মাঝে মাঝে কারণে অকারণে ছাত্রদের পিঠে দু'এক খান বেত না কষালে তারা পাঠ মনে রাখতে পারে না এটাই পণ্ডিত মশাইয়ের বিশ্বাস।

বাবুদের বাড়ির ছেলেদেরও বেত কষাতে তিনি কসুর করেন না। শুধু ও বাড়ির একজন কর্তা পণ্ডিত মশাইকে কানে কানে বলে দিয়েছেন, আর যাকেই শাস্তি দিন, মধুকে বেত মারা তো দূরের কথা, একটা চড়-চাপড় মারাও চলবে না। তা হলে কিন্তু পাঠশালা উঠে যাবে।

এ কথাটা পণ্ডিত মশাইকে মনে রাখতে হয়। তবু মাঝে মাঝে মধুকে মারবার জন্য তাঁর হাত নিশপিশ করে।

অন্য সব ছাত্রের তুলনায় মধু বেশি মেধাবী।

যে কোনও পড়াই দু'একবার শুনেই সে এমন ঝরঝর করে মুখস্ত বলতে পারে তা শুনে বিস্মিত হতে হয়। এ বালক যেন শ্রুতিধর। ভাল ছাত্রকে সব শিক্ষকই পছন্দ করেন, কিন্তু মধুর নিত্য নতুন দুষ্টুমি ও অবাধ্যপনায় অতিষ্ঠ হয়ে উঠতে হয়। তার প্রতি স্নেহ-

ভাল লাগাও উবে যায়।

পণ্ডিত মশাইয়ের মাঝে মাঝে মধু সম্পর্কে মনে হয়, এমন দুষ্টু গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভাল।

মধু কোনওদিন এক জায়গায় বসবে না। তার জন্য স্থান করে দেওয়া হয়েছে একেবারে সামনের সারিতে। সবাই মাদুর কিংবা চটের টুকরো নিয়ে আসে, তাই পেতে বসে। মধুর জন্য এখানেই রাখা থাকে পশমের আসন। কিন্তু মধু কিছুতেই সে আসনে বেশিক্ষণ বসে না।

এমনিতেই তার ছটফটে স্বভাব, একটু পরেই সে উঠে গিয়ে পেছন দিকে অন্য একটি ছেলের পাশে বসে পড়ে। তারপর জোরে জোরে জিজ্ঞেস করে, আজ কী দিয়া ভাত খাইছোস রে ? তগো বাড়ি কাসুন্দি হয় ?

এই রকম সব অবান্তর কথা।

সে নিজেও পণ্ডিত মশাইয়ের পাঠ শোনে না, অন্য পড়ুয়াদেরও শুনতে দেয় না।

পাঠশালার বাইরে কোনও গরু হাম্বা করে ডেকে উঠলে মধুও শব্দ করে ওঠে -- হাম্বা, হাম্বা।

সব ছেলেরা হেসে গড়াগড়ি খায়। শুধু রাগে পণ্ডিত মশাইয়ের মুখখানা লাল হয়ে যায়।

দোষ করে মধু, তিনি শাস্তি দেন অন্য ছেলেদের। মধুকে যে মারা যাবে না, বকাও যাবে না।

মধু তা জানে বলেই বেশি বেশি উত্যক্ত করে গুরুমশাইকে।

একদিন তিনি আর ধৈর্য রাখতে পারলেন না। মধুকে একবার এখানে, আবার অন্য জায়গায় গিয়ে বসতে দেখে তিনি বলে ফেললেন, বাবাধন তোমার নামটা মধু কে রাখছে ? তোমার নাম হওয়া উচিত ছিল শাখামৃগ।

কয়েকটি ছেলে হেসে উঠল।

মধু উঠে দাঁড়িয়ে পাশের ছেলেটিকে চোখ পাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, এই হাসলি যে ? তুই শাখামৃগ মানে জানোস ?

ছাত্ররা কেউই শাখামৃগ মানে জানে না। পণ্ডিত মশাইয়ের বলার ভঙ্গিতে হেসেছে।

মধু বলল, আমি জানি। শাখামৃগ মানে বান্দর।

পণ্ডিত মশাই বললেন, ঠিক কইছিস। তুই একখান বান্দরই তো। বান্দর যেমন একখানে চুপ কইরা বসতে পারে না, এক ডাল থিকা আর এক ডালে লাফ দেয়।

মধু বলল, আমি বান্দর। আমি বান্দর। হুপ হুপ হুপ।

তারপর থেকে মধু আর অন্য কোনও কথাই বলে না। শুধু হুপ হুপ হুপ শব্দ করে। বাড়িতে গিয়েও তাই। তার মা দারুণ ভয় পেয়ে জিজ্ঞেস করেন, কী হইল, কী হইল মধুর ?

মধু বলে, হুপ হুপ হুপ।

দুপুর-বিকেল-সন্ধে চলল এই একই রকম।

ভয়ে মুখ শুকিয়ে গেল বাড়ির লোকের। অনেকের ধারণা হল, মধু পাগল হয়ে গেছে।

মধুর বাবা এখানে থাকেন না। তিনি ওকালতি করেন কোলকাতায়। কাঁদতে কাঁদতে মধুর মায়েরও পাগল হবার উপক্রম।

বাড়ির মধ্যে মধুর সবচেয়ে বেশি ভাব ছোটাই দাদুর সঙ্গে।

এই ছোটাই দাদু মধুর বাবার ছোট কাকা। কাকা হলেও সে কিন্তু মধুর বাবার চেয়ে বয়েসে ছোট। মজার ব্যাপার, বয়েসে ছোট হলেও সে বাবার কাকা, আর মধুর মতন বাড়ির অন্যান্য ছেলেরা তাকে বলে ছোটাই দাদু। যদিও তার বয়েস মোটে বাইশ বছর, এখনও বিয়েই হয়নি।

এই ছোটাই দাদুর নাম মানিকরাম।

মানিকরাম বেশির ভাগ সময় বাড়িতেই থাকে না, গ্রামের ছেলেদের সঙ্গে আড্ডা দিয়ে বেড়ায়, যাত্রা করে, গান গায়। মানিকরাম মুখে মুখে পদ্য বানাতেও পারে।

সন্ধের পর বাড়িতে ফিরে সব শুনে মানিকরাম মধুর কাছে এসে জিজ্ঞেস করল, তোর কী হয়েছে রে মধু ?

মধু বলল, হুপ হুপ হুপ।

মানিকরাম হেসে বলল, বুঝছি, বুঝছি, তোরে কেউ বান্দর কইছে। ঠিকই তো কইছে। বান্দরকে বান্দর কবে না তো কী কবে ? আমারেও আমার পিতাঠাকুর কতবার কইছেন বান্দরটা, বান্দর একখান। আমি যদি বান্দর হই, আমার নাতি তুইও তো বান্দর হবি। তাই না ?

এরপর মানিকরাম নিজেও হুপ হুপ করে লাফাতে লাগল।

তখন হেসে ফেলল মধু।

মানিকরাম বলল, বান্দর মানে তো খারাপ না। স্বয়ং রামচন্দ্র বান্দর সেনার সাহায্য লইয়াই তো সীতারে উদ্ধার করছিলেন। তুই শুনবি রামায়ণের সেই গান ?

দুহাত তুলে নেচে নেচে মানিকরাম শোনাতে লাগল রামায়ণ গান।

এই সব সময়ে মধু সব দুষ্টুমি থামিয়ে মন দিয়ে শোনে।

এ কাহিনীর শুরু প্রায় পৌনে দুশো বছর আগে।

তখনও ভাল করে ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়নি এদেশে। সিরাজউদ্দৌল্লার পতনের পর মুর্শিদাবাদের গৌরব কমে আসছে ক্রমশ। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রধান ঘাঁটি কোলকাতা, নতুন শহর হলেও সেটা ফুলে ফেঁপে উঠেছে খুব তাড়াতাড়ি।

গ্রাম বাংলায় ছোট ছোট জমিদাররাই নিজেদের এলাকায় সর্বেসর্বা। ইংরেজের থানা পুলিশ সব জায়গায় পৌঁছতে পারে না।

গ্রাম বাংলায় হিন্দু ও মুসলমান মোটামুটি শান্তিতেই বাস করে। মাঝে মাঝে ছোট বা মাঝারি ধরনের ঝগড়া-বিবাদ হয় বটে, আবার নিজেরাই সেটা মিটিয়ে নেয়। দুই ধর্মের মানুষের মধ্যে ভেদনীতি চালাবার চিন্তা তখনও ইংরেজদের মাথায় আসেনি।

তখনও সরকারি ভাষা ফারসি। বড় বড় শহরের কিছু ব্যক্তি ছাড়া ইংরেজি প্রায় কেউই জানে না সারা দেশে। জমিদারির কাজকর্মও চলে ফারসি ভাষায়। হিন্দুরাও ফারসি ভাষা শেখে আর এই ভাষার দৌলতেই হিন্দুরা চাকরি পায় নবাব-জমিদারদের দরবারে।

মধুর ছোটাই দাদু মানিকরামও ফারসি এবং উর্দু ভাষা শিখেছিল ভাল করে। কিন্তু গান-বাজনার দিকেই তার ঝোঁক বেশি। তার কোনও উপার্জন ছিল না। বড় দাদাই সংসার চালান। বড় দাদা ব্যবসা করে হঠাৎ খুব ধনী হয়েছেন, ভাই-বোন, আত্মীয়স্বজন মিলিয়ে তাঁর পরিবারে প্রতিদিন বেয়াল্লিশ জনের রান্না হয় দুবেলা। ছোট ভাইটি রোজগার করতে না চায় না করুক, তা নিয়ে তিনি মাথা ঘামান না।

ছোট ভাইয়ের বিয়ে দেবার চেষ্টা করেছেন অনেকবার। হিন্দু পরিবারে ছেলেদের বিয়ে হয়ে

যায় পনেরো-ষোল বছরে, কিন্তু মানিকরামের বিয়ের দিকে একেবারেই মন নেই।

হঠাৎ মানিকরামের একটা চাকরি জুটে গেল। বরং বলা যায়, সে চাকরি নিতে বাধ্য হল।

পাশের গ্রামের জমিদারের নাম নওশের আলি। তিনি অতি সজ্জন জমিদার, কখনও কারোকে চোখ রাঙিয়ে কথা বলেন না। বাগদাদের হারুন-অল-রশিদের মতন তিনি রাত্তিরবেলা চুপি চুপি সাধারণ মানুষের বেশে গ্রামের রাস্তা দিয়ে হেঁটে বেড়ান। কারোর বাড়িতে কান্না কিংবা ঝগড়া শুনতে পেলে তিনি হঠাৎ সেখানে গিয়ে উপস্থিত হন। এইভাবে অনেক ঝগড়া-বিবাদ, এমনকী খুনোখুনির সম্ভাবনাও তিনি সঙ্গে সঙ্গে মিটিয়ে দিয়েছেন।

জমিদার হয়েও নওশের আলির হারেম নেই। তাঁর বিবি মাত্র একটিই। তাঁর প্রজাদের মধ্যে তিনি কখনও কোনও সুন্দরী রমণীর প্রতি মন্দ নজর দিয়েছেন, এ রকম কখনও শোনা যায়নি। অর্থাৎ দৈত্যকুলে প্রহ্লাদের মতন নওশের আলিও জমিদারকুলে এক অভিনব প্রাণী। প্রজারা আড়ালেও নিন্দা করে না, এরকম জমিদার আছে কজন?

নওশের আলি গান-বাজনার খুব ভক্ত।

উত্তর ভারত থেকে তিনি দুজন ওস্তাদকে আনিয়েছেন, তাঁরা কালোয়াতি গান শোনান। এছাড়াও স্থানীয় পল্লী-গায়কদের গানও শুনতে তাঁর ভাল লাগে। তাদেরও ডেকে আনেন মাঝে মাঝে।

মানিকরামেরও একটি গানের দল আছে। তারা হাটে-বাজারে গান গেয়ে বেড়ায়। নওশের আলির দরবারেও তাদের ডাক পড়েছে দু-একবার। আলি সাহেব সন্তুষ্ট হলে এইসব গায়কদের ভাল নজরানা দেন।

সেই রকমই একবার ডাক পড়ল মানিকরামের দলের।

মানিকরামই মূল গায়ক, আর তিনজন তার দোয়ারকি। ভারি সুন্দর চেহারা মানিকরামের, গৌরবর্ণ, লম্বা দোহারা শরীর, মাথার চুল ঘাড় পর্যন্ত বাবড়ি করা, টানা দুটি চোখ। যেন নদের নিমাই।

মুসলমান জমিদারদের খুশি করার জন্য সে সুর করে গাইতে লাগল উর্দু বয়েৎ :
ক্যা জাঁনু বজমে আয়েশকে সাকি কি চশম দেখ্
ম্যাঁয় সুহবতে শরাবসে আগে সফর কিয়া ...

শিক্ষিত মানুষ ছাড়া গ্রাম-বাংলার অধিকাংশ মানুষই ফারসি উর্দু বোঝে না।

জমিদারদেরও সেই একই অবস্থা।

নওশের আলি শুনতে শুনতে জিজ্ঞেস করলেন, এর মানে কী হল ? মানিকরাম বলল, হুজুর, এটা মির তকি মির-এর রচনা। তিনি বলছেন, কী আর জানব আরামের কথা, সাকির চোখ যেই দেখলাম, অমনি সুরাপান আর সঙ্গীদের ছেড়ে বেরিয়ে পড়লাম সফরে।

এরকম আরও দু-একটা বয়েৎ শোনার পর নওশের আলি বললেন, মানিকরাম, তুমি আগের দিন আমাকে তোমাদের রামায়ণ গান খানিকটা শুনিয়েছিলে। তারপর গল্পটা কী হল ? রাবণ নামে এক ব্যাটা বদমাস রাজা রামচন্দ্রের বউ সীতাকে চুরি করে পালাচ্ছিল। তারপর একটা পাখির সঙ্গে যুদ্ধ হতে লাগল --

মানিকরাম তখন রাবণের সঙ্গে জটায়ুর যুদ্ধের বিবরণ শুরু করল। গান চলছে, এর মধ্যে এক সময় জমিদারের এক কর্মচারী এসে জানাল মুর্শিদাবাদ থেকে একটা জরুরি ফরমান এসেছে।

নওশের আলি বললেন, কী লেখা আছে, পড়ো।

কর্মচারীটি কাঁচুমাচু ভাবে বললেন, হুজুর, আমার বিদ্যেয় কুলোয়নি। আমি এর মানে বুঝিনি। ফারসি জানা মুন্সি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, তিনি আসছেন না।

নওশের আলি ফরমানটা নিজের হাতে নিলেন।

অধিকাংশ জমিদারের মতন তিনিও লেখাপড়া বিশেষ করেননি। ফরমানটা পড়ার চেষ্টা করেও তিনি কিছুই বুঝতে পারলেন না।

আরও দুজন কর্মচারীকে ডেকে আনা হল। কেউই ঠিক মতন অর্থ উদ্ধার করতে পারে না। সবাই এতদিন নির্ভর করেছে বৃদ্ধ মুন্সির ওপর।

মানিকরাম গান থামিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সভাস্থলে।

এক সময় সে বিনীত ভাবে বলল, হুজুর, আমি একবার চেষ্টা করে দেখব ?

নওশের আলি বিস্মিতভাবে বললেন, তুমি ? তুমি ফারসি জানো ?

মানিকরাম বলল, কিছু কিছু জানি, যদি জরুরি বিষয় হয়, আমি বোধহয় পড়ে দিতে

পারব।

হাত বাড়িয়ে সেটা নিয়ে গড় গড় করে পড়ে অর্থ বুঝিয়ে দিল। ব্যাপারটা জরুরিই বটে। জমিদারের বাগের হাটের সম্পত্তির জন্য দুবছর কর দেওয়া হয়নি, তিন দিনের মধ্যে তা মিটিয়ে না দিলে সেই সম্পত্তি ক্রোক করা হবে।

নওশের আলি বেশ কয়েক মুহূর্ত বিস্মিতভাবে তাকিয়ে রইলেন মানিকরামের দিকে। বিস্মিত হবার কথাই বটে। ফারসি জানা ব্যক্তিরা বেকার থাকে না, তারা ভাল উপার্জন করে। বিশেষত এখন আদালতে ফারসি না জানলে উকিল হওয়া যায় না। এই ছেলেটি এত ভাল ফারসি ভাষা জ্ঞান নিয়েও শুধু গান গেয়ে বেড়ায়? নওশের আলি একটু পরে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার বাড়ি কোথায়? বংশ পরিচয় কী? মানিকরামের বড় ভাইয়ের নাম রামনিধি। তাকে যশোর-খুলনার সব মানুষ এক ডাকে চেনে। এ তল্লাটে রামনিধিই সবচেয়ে বড় উকিল। নওশের আলির হয়েও তিনি মামলা লড়েছেন দুবার।

সেই রামনিধির ভাই মানিকরাম নিছক একজন পল্লীগায়ক? অথচ কত তার গুণ?

নওশের আলি মানিকরামকে বখশিস দেবার বদলে বললেন, মানিক, তুমি কাল থেকে আমার সেরেস্তায় এসে বসবে। আমার মুন্সির বয়েস হয়েছে অনেক, তুমিই হবে নতুন মুন্সি। তোমার গান বন্ধ করার দরকার নেই, গান গাইবে, আমাকেও শোনাবে। কি, রাজি তো?

মানিকরামের চাকরি করার ইচ্ছা ছিল না একেবারে। টাকার টানাটানি না থাকলে কে আর গোলামি করতে চায়?

কিন্তু জমিদার নওশের আলির অনুরোধ মানেই আদেশের মতন। তা অগ্রাহ্য করা চলে না।

তাছাড়া শুধু জমিদার বলে নয়, মানুষটিও অতি সদাশয়। মানিকরাম নতমস্তকে বলল, জি হুজুর।

অচিরেই নওশের আলির অতি প্রিয় পাত্র হয়ে উঠলেন মানিকরাম।

জমিদারের মুন্সি হলে তার খাতির, প্রতিপত্তি অনেক বেড়ে যায়।

মানিকরাম এখন কুর্তা-শেরওয়ানি পরে, মাথায় জড়ির কাজ করা সাদা রঙের টুপি। সে ঘোড়ায় চড়াও শিখেছে। এমনিতেই সে সুপুরুষ, ঘোড়া ছুটিয়ে যখন সে যায়, রাস্তার দুপাশের লোক মুগ্ধভাবে তার দিকে চেয়ে থাকে।

যে মানুষ খুব তাড়াতাড়ি জনপ্রিয় হয়, তার শত্রুর সংখ্যাও বাড়ে। সে অন্য কারোর ক্ষতি করুক বা না করুক, তবু তাকে ঈর্ষা করতে শুরু করে কিছু লোক।

নওশের আলি মানিকরামকে বেশি বেশি প্রশ্রয় দিচ্ছেন বলে জমিদারি সেরেস্তার পুরোনো কর্মচারীরা ঘোঁট পাকাতে শুরু করে দিল তার বিরুদ্ধে। নওশের আলি তা টেরও পেলেন না।

এখন মানিকরামের বাড়ি ফিরতে আরও দেরি হয়। সারাদিন সে ব্যস্ত থাকে সেরেস্তার কাজে। অনেক চিঠি পড়তে হয়, মুসাবিদা করতে হয় সেগুলির উত্তর। এ কাজ করা একঘেয়ে লাগে, কিন্তু একবার চাকরি নিয়ে ফেলেছে, এখন আর পালাবার উপায় নেই। এক একদিন সন্ধের সময় জমিদারের নিজস্ব ভৃত্য কলিম তাকে ডেকে নিয়ে যায় অন্দরমহলে।

একজন কর্মচারীর পক্ষে জমিদারের বাড়ির মধ্যে প্রবেশের অধিকার পাওয়া স্বাভাবিক নয়। অন্য কর্মচারীর চোখ টাটায়।

আসলে জমিদার নওশের আলির এখন গান শেখার শখ হয়েছে। তিনি তো ইচ্ছে করলেই মাইনে করা ওস্তাদদের কাছে গান শিখতে পারেন। কিন্তু তিনি বাল্যকাল থেকে কখনও গান-বাজনার চর্চা করেননি। পিতার মৃত্যুর পর তাকে জড়িয়ে পড়তে হয়েছিল নানারকম মামলা-মোকদ্দমায়। এখন অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়েছেন।

কিন্তু তাঁর গলায় সুর নেই। ওস্তাদদের কাছে নাড়া বাঁধলে হাস্যাস্পদ হতে হবে, তা তিনি নিজেই বোঝেন। প্রকাশ্যে সবার সামনে রেওয়াজ করতেও তাঁর সঙ্কোচ হয়। তাই অন্দরমহলে, নিভৃতে এই ব্যবস্থা।

মানিকরামের গান শেখাতেও ভাল লাগে না। সে স্বভাব গায়ক, সে নিজে কখনও চর্চা করে গান শেখেনি। শুনে শুনে গান তোলে নিজের গলায়, মনের আনন্দে গান গায়। ছেলেবেলা থেকেই সে দেখেছে, তাদের বাড়িতে ফারসি-উর্দু শেখাবার জন্য যেমন মুন্সি আসে, তেমনি অনেক গায়কও আসে। গানের আবহাওয়াতেই সে মানুষ হয়েছে। মুসলমানদের বাড়িতে তেমন গান বাজনার চর্চা নেই, অনেক বাড়িতে গান-বাজনা নিষিদ্ধ। নওশের আলি অনেক নিয়ম-কানুনের তোয়াক্কা করেন না, মোল্লা-মৌলবিদের পাত্তা দেন না তেমন।

মানিকরাম সা-রে-গা-মা শেখাতে পারে না, সে একটা গান বারবার গায়, নওশের আলি সেই গান বারবার শুনে গলায় তোলার চেষ্টা করেন।

যাদের নিজেদের সুর জ্ঞান থাকে, তারা বেসুরো গান বেশিক্ষণ সহ্য করতে পারে না। নওশের আলির গলা এদিক ওদিক চলে যায়, তা শুনে মানিকরাম বিরক্ত বোধ করলেও মুখে কিছু বলতে পারে না। মনে মনে ভাবে কতক্ষণে ছুটি পাবে।

কয়েকদিন পর হঠাৎ সে গান শেখাবার ব্যাপারে বিশেষ উৎসাহ পেয়ে গেল। তার কারণটা অবশ্য অন্য।

একদিন সে নওশের আলির গলায় একটা গান তোলাচ্ছে, হঠাৎ তার নজরে পড়ল, পেছন দিকের পর্দা একটু ফাঁক করা, সেখানে দুটি চোখ উন্মুখ ভাবে তাকে দেখছে।

শুধু দুটি চোখ ছাড়া আর কিছু সে দেখতে পেল না। তবু সে ধরেই নিল, সে চক্ষু দুটি কোনও নারীর।

পুরুষ হলে তো সামনেই আসতে পারত।

পরপর কয়েকদিন একই জায়গায় সেই চক্ষু দুটি দেখতে পেয়ে মানিকরাম বুঝতে পারল, ওই চক্ষুর অধিকারিনী শুধু তাকে দেখে না। একজন পুরুষ মানুষকে এত দেখবার কী আছে ? আসলে সেই অন্তরালবর্তিনী গান শোনে। একই গান বারবার শোনে কেন, সে কি গান শিখতে চায় ?

এই নারীটি কে ? ইনি কি নওশের আলির বিবি ?

কোনও কোনও মানুষের মনে গানের প্রতি একটা স্বাভাবিক টান থাকে। সে নারীই হোক বা পুরুষই হোক। গান জাত-ধর্মও মানে না। প্রাকৃতিক কারণেই কোনও কোনও মানুষের কণ্ঠে ভর করে সুর।

নওশের আলি যতই খামখেয়ালি হোন না কেন, বাড়ির মেয়েদের গান শিখতে দেবেন, এতটা উদারতা তাঁর নেই। তাছাড়া তাতে সামাজিক বাধাও আছে। মানিকরামের বাড়ির মাসি-পিসিরা বাড়ির মধ্যে আপন মনে গান করে মাঝে মাঝে, এসব বাড়িতে তা সম্ভব নয়।

নিষিদ্ধ কাজে মানুষের উৎসাহ বেশি থাকে। জমিদার বাড়ির কোনও রমণী তার কাছে গান শিখতে চায় আড়াল থেকে, এটা বুঝতে পেরে মানিকরামের বিরক্তি অন্তর্হিত হয়ে গেল, সে এখন আর উঠতেই চায় না।

কখনও নওশের আলি গান থামিয়ে গোসলখানায় গেলে তখনও চোখ দুটি চেয়ে থাকে মানিকরামের দিকে।

সরাসরি তাকাতে মানিকরামের লজ্জা করে। সে এক পলক দেখে, তারপর মুখ নামিয়ে নেয় মাটির দিকে।

শুধু দুটি চোখ। আর কিছু না। চোখ দুটি কার তা এখনও মানিকরাম জানে না।

সারাদিন সেরেস্তায় কাজ করার পর সন্ধেবেলা গান শেখাতে আসে বলে মানিকরামের খিদে পায়, তাকে কিছু খাবার দেওয়া হয়। হিন্দুদের খাওয়ার ব্যাপারে অনেক বাছবিচার আছে, মুসলমানের বাড়িতে কোনও রকম রান্না করা খাবার তারা স্পর্শ করে না, পাছে তাতে গো-মাংসের স্পর্শ লেগে থাকে। কিন্তু খই-দুধ-কলা কিংবা মণ্ডা-মিঠাইয়ে তাদের আপত্তি নেই। মানিকরাম মিষ্টি খুব ভালবাসে।

প্রত্যেকদিন একজন ভৃত্য রুপোর রেকাবিতে নানা রকম মিষ্টি দ্রব্য সাজিয়ে নিয়ে আসে। একদিন কোনও কারণে সেই ভৃত্য অনুপস্থিত, পর্দার আড়াল থেকে একটি হাত বেরিয়ে এসে খাবারে রেকাবিটা রেখে দিল।

সে হাত যেন মাখন দিয়ে গড়া। সে হাতের আঙুলগুলো যেন না ফোটা চাঁপা ফুল। সে হাতের নখে যেন করমচার রক্তিম আভা।

সেই দুটি চোখ আর একটি হাত মানিকরামের হৃদয় হরণ করে নিয়ে গেল।

এতদিন সে বিয়ে করতে চায়নি, মেয়েদের সম্পর্কে উদাসীন ছিল। এখন তার ধ্যান-জ্ঞান হল দুটি গভীর কালো চোখ আর একটা জ্যোৎস্না দিয়ে গড়া হাত।

মানিকরাম জানে, ওই অন্তরালবর্তিনীকে সে কোনওদিনই পুরোপুরি দেখার সুযোগ পাবে

না, কিন্তু কল্পনা তো বাধা মানে না।

জমিদার বাড়ি থেকে রাত্তিরবেলা ঘোড়া ছুটিয়ে যেতে যেতে সে যেন আর কিছুই দেখতে পায় না, শুধু দুটি চোখ আর একটি হাত। এক একদিন তার বাড়ি ফিরতেও ইচ্ছে করে না, সারারাত ধরে চললেই বা ক্ষতি কী ?

বাড়িতে ফিরতে হয় অবশ্য অন্য কারণে। স্নেহের টানে।

এ বাড়ির সবচেয়ে অবাধ্য ছেলেটি একমাত্র মানিকরামের বশ। মানিকরাম যতক্ষণ না বাড়ি ফেরে, ততক্ষণ সে কিছু খাবেও না, ঘুমোতেও যাবে না।

এমনকী মায়ের কথাও সে শোনে না। খাবারের থালা দিলে সে ঠেলে সরিয়ে দেয়। না খেয়ে থাকতেও তার আপত্তি নেই। ছোটাই দাদু পাশে বসে গল্প শোনাবে কিংবা গান গাইবে, তবে সে খাবার মুখে দেবে। এমনই তার জেদ।

খাওয়া নিয়ে মধুর নানারকম বায়নাক্কা আছে।

এইটুকু ছেলে, এরই মধ্যে সে খাবার একেবারে হাতে গরম না হলে খেতে পারে না। তার আর একটা দাবি, দুপুর বেলা স্নান করে আসার সঙ্গে সঙ্গে তাকে খেতে দিতে হবে। স্নান করার পরই তার দারুণ খিদে পায়।

কিন্তু একই সঙ্গে ভাত, ডাল, শাক ভাজা, বেগুন ভাজা, তরকারি, মাছের ঝোল, একেবারে গরম রাখা কী করে সম্ভব ? অথচ প্রত্যেকটিই গরম না থাকলে সে ছুড়ে ফেলে দেবে।

এরকম বিশ্রী স্বভাবের জন্য তাকে জোর ধমক দেবারও তো উপায় নেই।

অন্য দুটি ভাই মারা গেছে, বাপ-মায়ের সে সবেধন নীলমণি, অন্য গুরুজনদেরও সে চোখের মণি, তাকে কোনও রকম শাসন করা যাবে না।

শাসন না করেও মধুকে জব্দ করেছিল মানিকরাম।

মধু সব কিছুই গরম খেতে চায় তো বেশ ভাল কথা।

মানিকরাম একদিন ইট দিয়ে সাতখানা উনুন বানিয়েছিল পুকুরধারে। তার এক একটিতে ভাত-ডাল-তরকারির পাত্র চাপাল, সব কটা ফুটছে এক সঙ্গে।

মধু পুকুরে ডুব দিয়ে আসামাত্র মানিকরাম বলল, বোস, এক্ষুনি এখানেই খেতে বোস। বাড়ি যেতে যেতে ঠান্ডা হয়ে যাবে।

একখানা বড় থালায় সব খাবার পরিবেশন করে মানিকরাম বলল, দ্যাখ, সবই গরম। সব একসঙ্গে খেতে হবে কিন্তু। যেটা পরে খাবি, সেটাই ঠান্ডা হয়ে যাবে।

তারপর থেকে মধু আর অত গরম খাবারের জন্য বায়না করে না। শুধু মাছ বা মাংস গরম দিলেই হয়।

সন্ধে থেকেই মধু কান পেতে থাকে, কখন ঘোড়ার টগবগ আওয়াজ শোনা যাবে। এক একদিন সন্ধে গড়িয়ে রাত আটটা-নটা-দশটা বেজে যায়, তখনও মধু কিছুতেই খেতে চায় না, মুখ গোমড়া করে থাকে।

কোনও এক সময়ে ঘোড়ার পায়ের শব্দ শুনলে মধুর মুখে হাসি ফোটে।

মানিকরামও এই স্নেহের টানে বাঁধা পড়ে গেছে।

স্বভাবের অনেক দোষ থাকলেও মধুর মতন আর কোনও ছেলে তো এমন তন্ময় হয়ে রামায়ণ-মহাভারত গান শোনে না ? মধু নিজে গান গাইতে পারে না, কিন্তু শুনে শুনে মুখস্ত করে ফেলতে পারে।

রাত্তিরবেলা বাড়ি ফিরে এসে মানিকরাম হাত মুখ ধুয়ে মধুকে নিয়ে বসেন। গল্প আর গান শুনতে শুনতে মধু খাবে, তারপর এক সময় ঘুমিয়ে পড়বে। এটা মানিকরামের প্রতিদিনের কর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাড়ির আর অন্য কোনও কাজ করে না সে, এইটুকু দায়িত্ব পালনে তার আপত্তি নেই।

মানিকরাম জিজ্ঞেস করে, আগের দিন রামায়ণের কাহিনী যতখানি বলেছি, মনে আছে তো ?

মধু ঘাড় নেড়ে বলে, হ্যাঁ, মনে আছে। হনুমান সমুদ্র পেরিয়ে এল লঙ্কায়। তারপর সীতার জন্য এখানে খোঁজে, ওখানে খোঁজে, কোথাও দেখা পায় না। কোথায় গেল সীতা ? তখন হনুমান মনে মনে বললেন :

এই লঙ্কা হইতে নাহি করিব গমন
এই লঙ্কা পুরে আমি ত্যজিব জীবন।।
কান্দিতে কান্দিতে বীর ছাড়িল নিঃশ্বাস।
রচিলা সুন্দর কাণ্ড কবি কৃত্তিবাস।।

মানিকরাম সন্তুষ্ট হয়ে বললেন, বাঃ এই তো দিব্যি মনে আছে দেখছি। শোন, এরপর কী হল --

কাঁদিতে কাঁদিতে বীর করে নিরীক্ষণ।
নানাবর্ণ পুষ্পযুক্ত অশোক কানন।।
পিকগণ কুহরে, ঝঙ্কারে অলিগণ।
প্রাচীরে বসিয়া বীর ভাবে মনে মন।। ...
... দেখিয়া সীতার দুঃখ কান্দে হনুমান।
অনুমানে যে ছিল সে দেখি বিদ্যমান।।
দশদিক আলো করে জানকীর রূপে।
ইহা লাগি ম্লান রাম দারুণ সন্তাপে।। ...

এক সন্ধেবেলা যথাসময়ে এক ভৃত্য মানিকরামকে ডেকে নিয়ে অন্দরমহলে বসিয়েছে। নওশের আলি তখনও আসেননি। মানিকরাম একটা সারেঙ্গি নিয়ে টুং টাং করতে করতে শুনতে পেল একটা কণ্ঠস্বর।

পর্দার ওপাশে খুব চাপা গলায় কেউ গান গাইছে। রমণী কণ্ঠ। খুব মন দিয়ে শুনে মানিকরাম বুঝল, গানের কথাগুলি এই --

আজু রজনী হম ভাবে পোহায়লুঁ
পেখলুঁ পিয়ামুখচন্দা
জীবন যৌবন সফল করি মানলুঁ
দস দিস ভেল নিরদন্দা ...

এটা মানিকরামের প্রিয় গান। কয়েকদিন আগে এ গান সে নওশের আলিকে দুবার মাত্র শুনিয়েছে। তিনি গলায় তুলতে পারেননি। তিনি মানিকরামকে বিভিন্ন ধরনের গান শোনাতে বলেন, তার মধ্যে দু-একটা তাঁর পছন্দ হয়, শেখার ইচ্ছে হয়।

নওশের আলি এ গানটা এখনও শিখতে পারেনি। কিন্তু অন্তরালবর্তিনী দিব্যি গাইতে পারছে।

মানিকরাম এখনও জানে না, ওই রমনীটি কে ? শুধু দুটি চোখে আর একটি হাত দেখেছে। তবে যে-ই হোক, তার সাহস আছে। এ রকম জমিদার বাড়ির অন্তপুরেও তো রমণীদের গান গাওয়া নিষিদ্ধ।

একই গান দু-তিনবার গাইছে শুনে মানিকরামের মনে হল, তবে কি রমণীটি তার কাছে গানের পরীক্ষা দিচ্ছে ?

ওর কথাগুলি ঠিকই আছে, তবে সুরে ছুট আছে একটু। মানিকরাম প্রথম লাইনটি গুনগুন করে শুদ্ধ সুরে গেয়ে উঠল।

পর্দার ওপাশের রমণীটিও গাইল তাকে অনুসরণ করে।

এইভাবে যেন এক অদেখা ছাত্রীকে শিক্ষা দেওয়া চলল। নওশের আলি এসে পড়ার পরেও মানিকরাম গেয়ে যেতে লাগল, থেমে গেল ওদিকের নারী কন্ঠ। নওশের আলি কোনও সন্দেহ করলেন না।

এর কয়েকদিন পরই কারা যেন হত্যা করার চেষ্টা করল মানিকরামকে।

সন্ধের পর সে ঘোড়ায় চেপে বাড়ি ফিরছিল। আকাশের সেদিন দুধ সাগরের মতন জ্যোৎস্না। অজস্র তারাগুলি যেন চাঁদের সহচরী। যেন আকাশ জুড়ে চলেছে এক উৎসব।

মানিকরাম ঘোড়ার গতি শ্লথ করে আকাশ দেখতে দেখতে চলেছে দুলকি চালে। গান গাইছে আপন মনে।

এক জায়গায় একটা বড় বাঁশবাগান পেরিয়ে আসতে হয়। পাশেই একটা পুকুর, অন্য পাশে শ্মশান। রাত্তিরবেলা অনেকেই এ জায়গা দিয়ে যেতে ভয় পায়।

মানিকরামের ভয়-ডর নেই।

প্রত্যেকদিনই এ জায়গাটা সে নিশ্চিন্ত ভাবে পার হয়ে যায়, ভূত-প্রেতের কথা তার মনেই পড়ে না।

সেদিন হঠাৎ গোটা চারেক ছায়ামূর্তি তার ঘোড়ার সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল।

মানিকরাম গান গাইতে গাইতে অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল, হঠাৎ ঘোড়াটা চিঁ হিঁ হিঁ শব্দ করে সামনের পা দুটো উঁচু করতেই সে চমকে গেল।

মূর্তিগুলোকে দেখে সে ভাবল, সত্যিই ভূত নাকি ?

গ্রামবাংলার হিন্দুরা ভূতের ভয় পেলে অমনি বলে ওঠে, 'ভূত আমার পুত পেত্নি আমার ঝি/রাম-লক্ষ্মণ বুকে আছে করবি আমার কী ?' অমনি ভূতেরা পালিয়ে যায়।

কিন্তু এই ভূতদের কাছে আছে লাঠি-সোঁটা, তারা বিকট চিৎকার করে মারতে শুরু করল তাকে।

প্রথম আঘাতটা লাগল মাথায়, মাথা ফেটে রক্ত পড়তে লাগল। কিন্তু সে জ্ঞান হারাল না। চেঁচিয়ে উঠল, আমায় মারছ কেন, আমার কাছে টাকা-পয়সা কিছু নেই।

তবু তার পিঠে-বুকে লাঠির ঘা পড়ছে, আর সে কোনওক্রমে ঘোড়া ছুটিয়ে চলল খুব জোরে।

একেবারে বাড়ির উঠোনে এসে সে ধপ করে পড়ে গেল অজ্ঞান হয়ে।

শেষ পর্যন্ত প্রাণে বেঁচে গেল মানিকরাম। কবিরাজি চিকিৎসায় সুস্থ হয়ে উঠল কয়েকদিন পর।

কারা তাকে মারতে এসেছিল তা সে কিছুই বুঝতে পারল না।

এরপর বিপদ এল অন্যদিক থেকে।

অসুস্থতার জন্য মানিকরাম কয়েকদিন সেরেস্তার কাজে যেতে পারেনি, জমিদারকে গান শেখানো হয়নি। জমিদারকে খবর পাঠানো হয়েছিল, তিনি জানিয়েছেন, পুরোপুরি সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত সে বিশ্রাম নিক। ব্যস্ত হবার কোনও কারণ নেই।

সেইদিন মানিকরাম অন্নপথ্য করেছে, অর্থাৎ ভাত খেয়েছে সিঙ্গি মাছ আর কাঁচকলার ঝোল দিয়ে, পরের দিনই তার কাজে যোগ দেওয়ার কথা। দুপুরে খানিকটা ঘুম দেবার পর বিকেলে উঠে দেখল একটা হই চই পড়ে গেছে পুকুরপারে।

পুকুরের উল্টোদিকের বাড়ি ও বাগানের মালিক অন্য একটি পরিবার। তাদের বাগানে কয়েকটি অত্যন্ত ভাল জাতের আমগাছ আছে। এ বাড়ির ছেলেরা মাঝে মাঝে লুকিয়ে ওপারের বাগানের ফুল চুরি করতে যায়। আজ দুপুরে কয়েকজন জ্যাঠতুতো ও পিসতুতো ভাই মধুকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিল সেই বাগানে।

মধুই সবচেয়ে বয়েসে ছোট, সে গাছেও চড়তেও শেখেনি ভাল করে। কিন্তু সে অন্য ভাইদের সমান হতে চায়। তাদের সঙ্গেও সেও উঠেছিল একটা আমগাছে। একজন জ্যাঠতুতো দাদা ইচ্ছে করে মধুকে তুলে দিয়েছে একেবারে মগডালে। ওখান থেকে সে আম ছিঁড়ে ছিঁড়ে ফেলে দিচ্ছে নীচে।

এই সময় লাঠি নিয়ে তেড়ে এল ও বাড়ির দুই দারোয়ান। অন্য ছেলেরা ঝপঝপ লাফিয়ে গাছ থেকে নেমে পিঠটান দিয়েছে। মধু পারল না। অত উঁচু থেকে নীচের দিকে তাকিয়ে তার মাথা ঘুরে যাচ্ছে।

এর মধ্যে আবার একটা কুকুর এসে হিংস্রভাবে ডাকতে লাগল ঘেউ ঘেউ করে। মধু কুকুরকে খুব ভয় পায়। এবার সে কেঁদেই ফেলল।

এ বাড়ির দারোয়ানরাও জানে, মধু কত আদরের ছেলে। তারা তো আর শাস্তি দিতে চায়নি, শুধু ভয় দেখাতে এসেছিল।

মধুকে কাঁদতে দেখে তারা বলতে লাগল, নেমে এসো, কোনও ভয় নেই, আমরা কিছু বলব না।

মধু তবু নামতে পারছে না।

দারোয়ানদের অভয় বাণী শুনে ফিরে এসেছে অন্য ছেলেরা। তারাও সবাই মিলে চেঁচিয়ে বলতে লাগল, মধু, নেমে আয়, মধু, নেমে আয়।

মধু তবু নামতে পারে না।

তখন ডেকে আনা হল মানিকরামকে।

প্রথমে সে মধুকে কাঁদতে দেখে হেসে ফেলল। মধু সহজে কাঁদে না। মানিকরাম বুঝে গেল, মধু আসলে ভয় পাচ্ছে কুকুরটাকে।

কুকুরটাও এমন নাছোড়বান্দা, তাড়িয়ে দিলেও যায় না, আবার ঘেউ ঘেউ করে ফিরে আসে। কুকুরটাও মজা পেয়েছে বোধহয়।

মানিকরাম বলল, আস্তে আসতে নেমে আয় মধু। আমি কুকুরটাকে সামলাব।

একমাত্র ছোটাই দাদুর কথাতেই ভরসা পায় মধু। সে একটা একটা ডাল ধরে নামতে লাগল। অনেকটা এসে বলল, ছোটাই দাদু, কুকুরটাকে সরাও।

মানিকরাম বলল, এবার তুই ঝাঁপ দে। আমি তোকে লুফে নেব। কুকুর কী করবে? ঝাঁপ দিতে গিয়েও মধু পুকুর ধারের রাস্তার দিকে তাকিয়ে বলল, ওই কারা আসছে? ওরা আমাকে ধরবে?

মানিকরাম পেছন ফিরে দেখল, লাঠি আর বর্শা হাতে নিয়ে চারজন লোক দ্রুত পায়ে ছুটে আসছে এদিকে।

মানিকরাম কৌতূহলী হয়ে তাকিয়ে রইল।

ওই চারজনের মধ্যে একজনকে চিনল সে, জমিদারদের খাস পেয়াদা মনিরুদ্দি।

ওরা কাছে আসার পর মনিরুদ্দি মানিকরামকে সেলাম করে বলল, আপনাকে এখুনি পীরগঞ্জে যেতে হবে, জরুরি তলব হয়েছে।

মানিকরাম অবাক হয়ে বলল, কালই তো আমার কাজে যোগ দেবার কথা, আজ বিকেলে এত জরুরি তলব কীসের? কে তলব দিয়েছে।

মনিরুদ্দি জানাল যে স্বয়ং জমিদার সাহেবের আদেশ।

মানিকরাম ভাবল, তা হলে কি নবাবের দরবার থেকে জরুরি কোনও চিঠি এসেছে?

তাহলে তো না গিয়ে উপায় নেই।

তবু সে জিজ্ঞেস করল, কাল সকালে গেলে চলবে না ? এখন তো সন্ধে হয়ে এসেছে।

মনিরুদ্দি জানাল যে তার ওপর হুকুম আছে, এই সন্ধের মধ্যেই মানিকরামকে সঙ্গে নিয়ে ফিরতে হবে।

জমিদারের হুকুমের ওপর কোনও কথা চলে না। অগত্যা যেতেই হবে।

মধুকে গাছ থেকে নামিয়ে দিল মানিকরাম।

মনিরুদ্দি হাত তুলে তাকে নিষেধ করে বলল, ঘোড়া নিতে হবে না। পাইকরা পায়ে হেঁটে এসেছে, তাদের সঙ্গেই যেতে হবে মানিকরামকে।

কয়েকদিন অসুস্থতার জন্য মানিকরামের শরীর এখনও দুর্বল, ঘোড়ায় চড়ে যাওয়াই তার পক্ষে স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু মনিরুদ্দি তাকে ঘোড়া নিতে দেবে না।

মানিকরামকে মাঝখানে রেখে চারজন পাইক চলতে শুরু করল।

মানিকরাম ভাবলেন, তাকে খবর দেবার জন্য শুধু মনিরুদ্দি এলেই তো পারত, চারজন তাকে ঘিরে রেখেছে কেন ?

মানিকরাম জিজ্ঞেস করল, কীসের জন্য এত জরুরি তলব, তা কি কিছু জানো মনিরুদ্দি ?

মনিরুদ্দি বলল, আমাদের কোনও কথা বলা নিষেধ আছে।

জমিদারের পেয়ারের লোক মানিকরাম, সেই জন্য মনিরুদ্দির মতন লোকেরা তার সঙ্গে খাতির করে কথা বলত, এখন মনিরুদ্দির ভাব-ভঙ্গি বেশ কঠোর।

সারা রাস্তা আর কেউ কোনও কথা বলল না। পীরগঞ্জের দূরত্ব সাড়ে পাঁচ মাইল। গ্রামের মানুষ এই দূরত্ব রোজই হেঁটে যাতায়াত করে। মাঝখানে একটা নদী আছে, সেখান থেকে ফেরি পার হলে দূরত্ব খানিকটা কমে যায়।

ফেরির নৌকায় লোক ভর্তি ছিল, তাদের নামিয়ে দেওয়া হল। জমিদারের লোক আগে যাবে।

এর মধ্যে নেমে এসেছে অন্ধকার।

জমিদার বাড়ি পৌঁছেও জমিদারের সঙ্গে দেখা হল না, কোনও কাজের কথাও জানা হল না। তাকে বসতে বলা হল একটা ছোট ঘরে।

মনিরুদ্দি দরজাটা টেনে বন্ধ করে দিল বাইরে থেকে। ঘরখানায় কুর্সি, কেদারা, চৌকি, বিছানা কিছুই নেই। একেবারে খালি। একটাই মাত্র জানালা আছে, সেটা অনেক ওপরে।

মানিকরামকে বসতে হল ধুলো মাখা মেঝের ওপর।

এটা কি জেল কুঠুরি নাকি ?

জমিদারবাড়ির অন্দরমহলে সুসজ্জিত কক্ষে নরম গালিচার ওপরে যার বসার অধিকার ছিল, তার এমন জায়গায় স্থান হল কোন অধিকারে ?

মানিকরাম আকাশ পাতাল চিন্তা করেও খুঁজে পেল না, সে কী অপরাধ করেছে ? সে সব সময় অনুগত। বাধ্যের মতন সেবা করেছে জমিদারের। চিঠিপত্র পড়া ও লেখা তার কাজ, সেরেস্তায় টাকা-পয়সা আদায় খরচের ব্যাপারে তার হাত নেই। তার নামে কেউ চুরির অভিযোগ দিতে পারবে না।

জমিদার নওশের আলি উদার স্বভাবের মানুষ। তিনি প্রজাদের মধ্যে হিন্দু-মুসলমানের কোনও ভেদ করেন না। তবে হঠাৎ কেন তিনি মানিকরামের ওপর এমন বিরূপ হলেন ?

ভেবে ভেবে কিছুই উত্তর পায় না মানিকরাম।

রাত বাড়তে লাগল, কেউ আর তার খোঁজখবরও নিতে এল না।

এক সময় থপথপ আওয়াজ হতে সে চমকে উঠল।

জানালা দিয়ে আসা স্বল্প আলোয় সে দেখতে পেল একটা ব্যাঙ ঢুকে পড়েছে ঘরের মধ্যে।

নিশ্চয়ই দরজাটার তলায় একটু ফাঁক আছে। ব্যাঙ ঢোকার পক্ষে একটু ফাঁকই যথেষ্ট।

মানিকরামের সমস্ত রোমকূপ খাড়া হয়ে গেল।

ব্যাঙ দেখে সে ভয় পায় না, কিন্তু ব্যাঙের পিছু পিছু সাপ আসতে পারে।

একটা লাঠিও নেই যে সে সাপ এলে আত্মরক্ষা করবে। মানিকরাম তীক্ষ্ম চোখে চেয়ে রইল দরজার দিকে।

সাপ অবশ্য এল না, কিন্তু এক মুহূর্তের জন্য ঘুমুতেও পারল না মানিকরাম। দরজার দিকে তাকাতে তাকাতেই যেন কেটে গেল সারা রাত।

জানালা দিয়ে সূর্যের আলো এসে পড়েছে। তা দেখে দেখে মানিকরাম বুঝতে লাগল কত বেলা বাড়ছে।

প্রায় দুপুরের সময় ঝনাৎ করে দরজা খুলে গেল।

বাইরে দাঁড়িয়ে আছে স্বয়ং নওশের আলি ও তার দুই ব্যক্তি। তাদের মধ্যে একজন কলিমউদ্দিন গোমস্তা, মানিকরামের ওপরওয়ালা। সে কোনও দিনই মানিকরামকে সুনজরে দেখেনি।

নওশের আলি গম্ভীর গলায় বললেন, মানিকরাম তুমি যা অন্যায় করেছ তার জন্য তোমার গর্দান নেওয়া উচিত ছিল। তার বদলে তোমার বাঁচার দুটি উপায় আছে। তোমাকে কলমা পড়ে মুসলমান হতে হবে দু-একদিনের মধ্যে। অথবা তুমি পীরগঞ্জের ত্রিসীমানার মধ্যে আর কোনওদিন পা দিতে পারবে না। এখানে তোমাকে কেউ দেখতে পেলেই তোমার পা কেটে দেবে, হাত কেটে দেবে।

বিচারের আগেই শাস্তি ? আসামিকে জানতেও দেওয়া হবে না, সে কী অপরাধ করেছে ?

মানিকরাম হাত জোড় করে বলল, হুজুর, আমি আপনার প্রত্যেকটি আদেশ মেনে চলেছি। জ্ঞানত কোনও অন্যায় করিনি। তবে কেন আমার ওপর আপনার এত রাগ হল ?

নওশের আলি পাশের ব্যক্তিটির দিকে তাকিয়ে নির্দেশ দিলেন, তুমি বলে দাও।

কলিমউদ্দিন মুখস্তের মতন গড়গড় করে বলে গেল, এই কাফেরটা একটা কাল সাপ। দুধকলা দিয়ে এই কাল সাপ পোষা হয়েছে। আমাদের জমিদার প্রভু, কত উদার, মহান, হিন্দুদের বাড়াবাড়ি রকম প্রশ্রয় দেন। সেই সুযোগ নিয়ে এই দুশমনটা অন্দরমহলে ঢুকে চুরি করতে গেছে।

মানিকরাম আঁতকে উঠে বললেন, চুরি ?

নওশের আলি বললেন, চোপ। কলিমউদ্দিন বললেন, চুরিই তো।

জমিদারের চোখের মণি, তাঁর বুকের ধন, তাঁর একমাত্র মেয়ে কুলসমকে চুরি করতে গেছে। সে অতি সরল মেয়ে, সংসারের জ্ঞান কিছু হয়নি, তাকে ভুলিয়ে ভালিয়ে এই

দুশমনটা তার সঙ্গে আশনাই করেছে। কুলসমের সঙ্গে এই বেতমিজটাকে দেখা গেছে নদীর ধারে, রাতের বেলা বাগানে গেছে, ঘোড়ায় চড়িয়েছে, এক সঙ্গে গান গেয়েছে। কুলসমকে নষ্ট করেছে এই কাফের। ওর প্রাণদণ্ডই হওয়া উচিত।

মানিকরাম কয়েক মুহূর্ত চোখ বিস্ফারিত করে তাকিয়ে রইল।

এর প্রত্যেকটি কথা মিথ্যে।

যার শুধু দুটি চোখ আর একটি হাত ছাড়া আর কিছুই দেখেনি মানিকরাম, তাকে নিয়ে নদীর ধারে, জঙ্গলে, ঘোড়ার পিঠে চাপিয়ে বেড়ানো একেবারে অবাস্তব, অসম্ভব কথা।

সে এই প্রথম জানল, পর্দার আড়ালের মেয়েটি জমিদারের কন্যা। সে কি ইচ্ছে মতন বাড়ির বাইরে যেতে পারে ?

শুধু এইটুকুই সত্যি যে তারা দুজনে একদিন এক সঙ্গে গান গেয়েছিল। তাও তো মেয়েটিকে না দেখে। সেখানে আর কেউ ছিল না। তবু অন্য কেউ জানল কী করে ?

কথায় বলে, দেওয়ালেরও কান আছে। কোনও দেওয়ালই খবর ছড়িয়েছে?

মানিকরাম হাঁটু গেড়ে মাটিতে বসে পড়ে পড়ল, হুজুর, আপনি আমাকে যা শাস্তি দিতে চান, দিন। কিন্তু আমি এসব কিছুই করিনি। আপনার মেয়েকে আমি কখনও চোখেই দেখিনি। এ আমি আমার বাপ-মায়ের নামে দিব্যি করে বলছি। আমি এ পর্যন্ত নারী জাতির কারোর প্রতি চোখ তুলে কথাই বলিনি।

এই সময় একটা নাটকীয় ঘটনা ঘটল। আব্বাজান, আব্বাজান বলে কাঁদতে কাঁদতে একটি কিশোরী মেয়ে ছুটে এল সেদিকে। তার পেছনে পেছনে দুজন দাসী।

এতদিন যাকে দেখেনি মানিকরাম, এই প্রথম দেখল তাকে। জড়ি আর চুমকি বসানো সালোয়ার আর কামিজ পরা, মাথার চুল এক বেণী করা, বয়েস হবে ষোল-সতেরো, সুর্মা টানা চোখ। ফর্সা শরীরটা পুরোপুরিই যেন লাবণ্য দিয়ে গড়া।

সে ছুটে এসে নওশের আলিকে জড়িয়ে ধরে একবার পরিপূর্ণ চোখ মেলে দেখল মানিকরামকে।

দাসী দুজন এসে তাকে ধরে টানাটানি করতে শুরু করেছে। নওশের আলি নরম গলায় বললেন, যাও কুলসম, ভেতরে যাও। এ রকম পাগলামি করে না।

দাসী দুজনের সঙ্গে ফিরে গেল কুলসম।

নওশের আলি চোখের ইঙ্গিতে কলিমুদ্দিনকে সরে যেতে বলে নিজে চলে এলেন ঘরের ভেতরে। দরজাটা বন্ধ করে দিলেন।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, কোনও কিছুই গোপন রাখা যায় না। তোমাকে যে এই ঘরে আটকে রাখা হয়েছে, তা মেয়েটা জেনে গেল কী করে? ও ভেবেছে বুঝি তোমাকে খুন করা হবে। শোনো মানিকরাম, তুমি কতটা কী করেছ জানি না। ব্যাপারটা অনেক দূর ছড়িয়েছে। ওই কলিমউদ্দিনরা তিলকে তাল বানাতে পারে। আমার মেয়ের হাবভাবেই সবার সন্দেহ হচ্ছে। সে পছন্দ করে ফেলেছে তোমাকে। আমার বংশে যাতে কোনও কলঙ্ক না লাগে, তাই কলিমউদ্দিনরা চায় তোমাকে একেবারে খতম করে দিতে।

কয়েক পলক তিনি মানিকরামের দিকে তাকিয়ে থেকে আবার বললেন, কী কুক্ষণে আমার গান শেখার বাতিক হয়েছিল, তোমাকে ঢুকিয়ে ছিলাম অন্দরমহলে। না হলে তো এসব কিছুই হত না। এখন কী করি বলো তো ? মানুষ মারা আমার স্বভাব নেই। তোমার কোনও ক্ষতিও আমি করতে চাই না।

মানিকরাম হাত জোড় করে বলল, আপনি হুকুম করলে আমি আর এ তল্লাটে কোনওদিনও আসব না।

নওশের আলি বললেন, তাতেও আমার মেয়ে যদি শান্ত না হয় ? ওই আমার একমাত্র মেয়ে। তোমার সঙ্গে ওই মেয়ের শাদি দিতে আমার আপত্তি নেই। কিন্তু আমাদের সমাজে বিধর্মীকে কন্যা দান করা চলে না। আমার জমিদারিতে আমি এ পর্যন্ত জোর করে কারোকে ধর্মান্তরিত করতে দিইনি। তুমি স্বেচ্ছায় যদি মুসলমান হতে রাজি থাকো --

মানিকরাম চুপ করে রইল।

নওশের আলি বললেন, এই মুহূর্তে সিদ্ধান্ত নিতে হবে না। তাতেও লোকে ভাববে, তোমার ওপর জোর করা হয়েছে। তুমি বাড়ি ফিরে যাও। চিন্তা করো। তোমার মুরুব্বিদের সঙ্গে কথা বল। সেখানেও অনেক সমস্যা হতে পারে। মোট কথা, ঠিক তিনদিন পর তুমি তোমার সিদ্ধান্ত আমাকে জানাবে। যাও, বাড়ি যাও।

সেখান থেকে বেরিয়ে মানিকরাম আস্তে আস্তে হাঁটতে লাগল। সে বুঝতে পারল, দূরে দূরে দাঁড়িয়ে তাকে দেখছে অনেকে। সে বহু লোকের লক্ষ্যবস্তু হয়ে আছে।

সে কারোর দিকে তাকাল না।

শুধু তার চোখে ভাসছে ছুটন্ত কিশোরীর রূপ। সেটা মুছে দিয়ে সে এখন আর চোখের সামনে কিছু রাখতে চায় না।

মানিকরাম এখন সব সময় ঘরে শুয়ে থাকে।

বাড়ির ছেলেরা এসে তাকে ডাকাডাকি করলেও সে যায় না। এমনকী মধুকেও সে ফিরিয়ে দেয়। শুধু রাত্তিরবেলা মধুর খাওয়ার সময় কিছুক্ষণের জন্য তাকে রামায়ণ মহাভারতের কাহিনী শোনাতেই হয়, অন্য সময় সে ঘর থেকে বেরোতেই চায় না।

সে পড়েছে মহাসঙ্কটে।

কুলসমকে একবার দেখার পর তার মনে হয়েছে, পৃথিবীর আর কোনও মেয়েকে সে কিছুতেই বিয়ে করতে পারবে না।

মহাভারতে সে পড়েছে, দ্রৌপদীকে দেখার পর জয়দ্রথের মনে হয়েছিল, দ্রৌপদী মানবী শ্রেষ্ঠা, তার তুলনায় আর সমস্ত নারীরাই বানরীর মতন।

কুলসমও যেন ঠিক তাই।

আরও একটা বড় কথা, কুলসমও তাকে চায়।

মানিকরামের বুকের মধ্যে বারবার ধ্বনিত হচ্ছে এই কথা, কুলসম তাকে চায়। তাকে শাস্তি দেওয়া হবে এই ভয়ে কুলসম লোকলজ্জা ভুলে কাঁদতে কাঁদতে ছুটে এসেছিল।

সেই অশ্রু মাখানো মুখটা মনে পড়ছে আর মুচড়ে মুচড়ে উঠছে মানিকরামের বুকে।

অস্ফুট স্বরে সে বারবার বলছে, কুলসম, কুলসম। এর চেয়ে সুন্দর শব্দ বুঝি আর হয় না।

কিন্তু এই বিয়ে হয় কী করে। মাঝখানে ধর্মের বিরাট বাধা। কোনও হিন্দু ছেলের সঙ্গে মুসলমান মেয়ের বিয়ে হতে পারে না।

মানিকরাম কার সঙ্গে পরামর্শ করবে ? তার পরিবারের লোকজন, আত্মীয় বন্ধু, কেউ কি বলবে তাকে মুসলমান হতে ? সকলেই তো ধর্মের গড়িমা আঁকড়ে ধরে আছে। ধর্ম রক্ষার জন্য অনেকে প্রাণ দিতেও রাজি।

মানিকরাম যদি সকলের আপত্তি অগ্রাহ্য করে নিজে জোর করে মুসলমান হতে চায়, তা হলে চিরকালের মতন সে তার মা-বাবা, পরিবার-পরিজন কারোর মুখ দেখতে পাবে না। সে আবাল্য পরিচিত সকলের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। এ বাড়ির ছোট ছোট ছেলেমেয়েগুলোকেও সে আর কোনওদিন আদর করতে পারবে না।

সবাই বলবে, সে এক জমিদারের মেয়েকে বিয়ে করে ঘর-জামাই হবার জন্য জাত ধর্ম খুইয়েছে। সে একটা লোভী, নীচ।

তার আর বন্ধুদের সঙ্গে দল বেঁধে গান গাওয়া হবে না।

তবু কুলসমের সঙ্গে কি আর একটিবারও দেখা হবে না ? কুলসম কেঁদেছিল, সেও কি কাঁদতে পারবে না কুলসমের সঙ্গে ?

বাড়ির কারুকে কিছু জানাতে পারল না মানিকরাম, জমিদার বাড়িতেও কোনও খবর পাঠাল না।

চতুর্থ দিন এল আবার জমিদারের পাইক, চারজন নয়, ছ'জন। পীরগঞ্জে এনে কোনও কুঠুরিতে আটকে রাখা হল না, সরাসরি আনা হল জমিদারের দরবারে।

নওশের আলি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি ঠিক করলে মানিকরাম ? মানিকরাম কোনও উত্তর না দিয়ে মাথা নিচু করে রইল। নওশের আলির মুখমণ্ডল কঠোর। তিনি বললেন, শোনো মানিকরাম, আমার মেয়ে অনবরত কেঁদে কেঁদে আমাকে পাগল করে দিচ্ছে। সে খায় না, ঘুমোয় না। তোমাকে ছাড়া সে আর কারুকে বিয়ে করবে না পণ করেছে। নইলে সে আর বেঁচে থাকতে চায় না। আমি তো আর আমার একমাত্র মেয়ের এই অবস্থা চোখে দেখতে পারি না। এবার আমাকে জোর করতেই হবে। মুসলমান হতেই হবে তোমাকে। আজ সারাদিন তুমি মৌলবি সাহেবের কাছে ইসলাম ধর্মের সারমর্ম বুঝে নেবে। পরশুদিন হবে তোমার দীক্ষা। সবার সামনে তুমি নামাজ পড়বে। তারপর হবে শাদির উৎসব।

মানিকরাম তখনও চুপ। নওশের আলি বললেন, কথা বলছ না যে ? তুমি পালাবার চেষ্টা করলে তার ফল ভালো হবে না। এই আমি বলে দিলাম।

মানিকরাম মুখ তুলে বলল, হুজুর, আপনি আমাকে জোর করে ইসলাম ধর্মে দীক্ষা দেবেন কেন ? তাতে আপনার ন্যায়-বিচারের নামে কলঙ্ক পড়বে। আমি স্বেচ্ছায় দীক্ষা নেব। সেই কথাটা সকলকে জানিয়ে দিন।

তুমি স্বেচ্ছায় দীক্ষা নেবে ?

জি হুজুর। আমি ভেবে দেখলাম, সব ধর্মই তো সমান। এক ধর্মের সঙ্গে আর এক ধর্মের প্রভেদ শুধু আচার-আচরণে। ভালোবাসা, যেমন গান-বাজনা, সব আচার-আচরণের ঊর্দ্ধে।

নওশের আলির চোখ দুটি ছলছল করে উঠল।

কিন্তু এত সহজে মিটল না ব্যাপারটা। মানিকরামের বড় ভাই রামনিধি যখন শুনলেন তাঁর ছোটভাইকে জোর করে ধরে নিয়ে গেছে পাশের গ্রামের জমিদার, রাগে অপমানে তিনি অগ্নিমূর্তি ধারণ করলেন। তিনি জমিদার নন বটে কিন্তু অর্থ প্রতিপত্তিতে তিনিও কম কিছু যান না। রামনিধি দত্তকে জজ-ম্যাজিস্ট্রেটরাও চেনে। তাঁর বড় ছেলে রাধামোহন খুলনা-যশোরের সবচেয়ে নাম করা উকিল।

রামনিধি অনেক কাল আগে থাকতেন খুলনার তালা গ্রামে। তারপর কোনও এক সময় চলে আসেন মামার বাড়ি সাগরদাঁড়িতে। সেখানেই তাঁদের সমৃদ্ধি সূচনা। কপোতাক্ষ নদীর ধারে গড়ে উঠেছে দত্ত বংশের বিশাল বাড়ি।

মানিকরামকে জোর করে মুসলমান করা হবে শুনে সাগরদাঁড়ির হিন্দুরাও উত্তেজিত হয়ে উঠল। এখন তো আর নবাব-বাদশার আমল নয়, কোম্পানির রাজত্ব, এখন এই অনাচার তারা মুখ বুজে সহ্য করবে কেন ?

কয়েকজন লাঠিয়াল ও লোক-লস্কর নিয়ে রাধামোহন ধেয়ে গেলেন পীরগঞ্জে। এই বুঝি লেগে যায় হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা।

নওশের আলি রক্তপাত চান না।

তিনি একা এসে রাধামোহনের সঙ্গে দেখা করে বললেন, দত্তদা, এ বিয়ে হবেই। আপনার কাকা আর আমার কন্যা দুজনেই বিয়ে করতে রাজি। সুতরাং অশান্তি আর হাঙ্গামা করে লাভ কী ? আপনি ওদের আশীর্বাদ করুন।

রাধামোহন বললেন, আপনি আমার কাকাকে চাকরির লোভ দেখিয়ে নিজের কাছে ধরে রেখেছেন। এখন নিজের মেয়েকে গছাতে চাইছেন তার ওপর। আমাদের সবাইকার জাত মেরে দেবেন গায়ের জোরে ? আমরা তা সহ্য করে, আশীর্বাদ করে যাব ? আমরা মান-সম্মান রক্ষা করতে জানি না ?

নওশের আলি বললেন, আপনি লাঠিয়াল সঙ্গে এনেছেন, জোর করে মানিকরামকে কেড়ে নেবেন ; রক্তারক্তি হবে, আপনি তাই চান ?

রাধামোহন বললেন, তার জন্য দায়ী হবেন আপনি। আপনিই আগে ওকে জোর করে ধরে এনেছেন। আমি ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকে খবর পাঠিয়েছি। হিন্দু-মুসলমানের বিয়ে হতে পরে না। আমার কাকা হবে মুসলমান ?

নওশের আলি বললেন, এ বিয়ে হবেই। আর স্বামী-স্ত্রীর দুরকম ধর্ম হতে পারে না। ধরা যাক, আমার মেয়েকে আমি বিয়ের পর আপনার বাড়িতে পাঠিয়ে দিলাম। তাকে কি আপনি হিন্দু করে নিতে পারবেন ? বলুন, বলুন ?

রাধামোহন সহসা উত্তর দিতে না পেরে চুপ করে গেলেন ?

নওশের আলি আবার জিজ্ঞেস করলেন, কিংবা আমার মেয়ে মুসলমান হয়ে গেলেও তাকে ঠাঁই দিতে পারবেন আপনাদের অন্দরমহলে ? তাকে হিন্দুও করবেন না, আবার মুসলমান থাকলেও মানতে পারবেন না, এ কেমন বিচার ?

এবারে খানিকটা সামলে নিয়ে রাধামোহন বললেন, আমরা নিজেদের নিয়েই সঙ্কটে আছি। হিন্দু হয়ে যারা জন্মায়, তারাই হিন্দু। অন্য ধর্ম থেকে লোক টেনে টেনে এনে আমরা সংখ্যা বাড়াতে চাই না। আপনারা আপনাদের মতন থাকুন, আমরা আমাদের মতন থাকি না কেন ? আপনারাই তো জোর করে অন্য ধর্মের লোকদের এনে নিজেদের ধর্মে দীক্ষা দিতে চান।

নওশের আলি বললেন, আপনার খুড়োর ওপর তো জোর করা হয়নি।

তাকে জোর করে ধরে আনাননি ?

সে নিজেই মুসলমান হয়ে আমার কন্যাকে বিয়ে করতে রাজি হয়েছে ? তার নিজের মুখেই শুনতে চান সে কথা ?

ডাকুন তাকে। আমি নিজের কানে না শুনলে বিশ্বাস করব না।

মানিকরামকে নিয়ে আসা হল সেখানে।

মানিকরাম সম্পর্কে কাকা হলেও রাধামোহনের চেয়ে বয়সে অনেক ছোট। বাবা খুবই বৃদ্ধ, রাধামোহনই এখন বাড়ির কর্তা, রাধামোহনকে সবাই সমীহ করে।

মানিকরাম চুপ করে রইল।

রাধামোহন আবার জিজ্ঞেস করলেন, ছোটকাকা, তুমি সত্যি করে বলো তুমি নিজে থেকে জমিদারের মেয়েকে বিয়ে করার প্রস্তাব দিয়েছ ?

মানিকরাম এবারেও চুপ।

রাধামোহন বললেন, তুমি মুসলমান হবার ইচ্ছে প্রকাশ করছ ? তোমার একার জন্য আমাদের পরিবারের সকলের জাত-ধর্ম তুমি নষ্ট করবে ? সমাজে আমরা সবাই পতিত হব ? তোমার নিজের বাবা-মায়ের কথা, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজনদের কথা তোমার মনে পড়ল না ? তাদের সবাইকে ছেড়ে, লোভের বশবর্তী হয়ে তুমি বিধর্মী হবে ? তোমার মান-সম্মান বলে কিছু নেই, তোমার লজ্জা নেই ?

মানিকরাম এবার মুখ তুলে কিছু বলতে চাইলেও তা বলা হল না। রাধামোহনের সঙ্গের লোকজন চিৎকার করে তাকে ধিক্কার দিতে লাগল। এর মধ্যে ঘোড়া ছুটিয়ে সদলবলে এসে উপস্থিত হলেন ম্যাজিস্ট্রেট ডগলাস সাহেব। তিনি খবর পেয়েছেন যে পীরগঞ্জে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা হতে যাচ্ছে। কয়েক মাস আগে যশোরের কয়েকটি অঞ্চলে নীলকর প্রজারা বিদ্রোহ শুরু করেছে, তা দমন করার জন্যে তিনি ব্যতিব্যস্ত। এর মধ্যে আবার হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা তিনি সহ্য করবেন না।

এখানকার সব ঘটনা শুনে তিনি বললেন, হিন্দু-মুসলমানের বিয়ে ? যেখানে দুপক্ষ লাঠি উঁচিয়ে আসে, সেখানে এ বিয়ে কিছুতেই বরদাস্ত করা হবে না। আমাদের দেশেও ইহুদি আর খ্রিস্টানদের মধ্যে বিয়েতে এরকম মতভেদ হয়, সংঘর্ষ হয়। এখন এখান থেকে দুপক্ষই হটে যাও। যদি দু-গ্রামের একশো জন মুসলমান আর একশো জন হিন্দু পিটিশন করে আমাকে জানায় যে এই বিয়েতে তাদের মত আছে, তখন আমি বিবেচনা করে দেখব। তার আগে, আমি সাবধান করে দিচ্ছি, কেউ কারোর মুখোমুখি হবে না।

তিনি আরও আদেশ দিলেন, মানিকরামকে এক্ষুনি ফিরে যেতে হবে নিজের গ্রামে। পীরগঞ্জের দিকে আসাই তার নিষেধ।

রাধামোহনের সঙ্গের লোকজন উল্লাস ধ্বনি করে উঠল। এটা যেন তাদেরই জয়। মানিকরামকে কয়েকজন জোর করে তুলে নিল কাঁধে।

এর কয়েকদিন পর রাধামোহন তাঁদের বাড়িতে বিরাট এক উৎসব করলেন। উপলক্ষ যদিও তাঁর একটি অসুস্থ পুত্রের আরোগ্য লাভ, কিন্তু তিনি যে কত বড় হিন্দু সেটা প্রমাণ করাই আসল উদ্দেশ্য। পুজো হল একশো আটটি কালীমূর্তির। একশো আটটি করে মোষ, ভেড়া ও পাঁঠা বলি হল।

মূর্তিগুলোর সামনে উৎসর্গ করা হল একশো আটটি সোনার তৈরি জবা ফুল। ম্যাজিস্ট্রেট ডগলাস সাহেবের সেই বিধানের ফলে সম্পূর্ণভাবে বদলে গেল তিনটি মানুষের জীবন।

ধর্ম কিংবা রাজশক্তির ভয় দেখিয়ে তো আর মানুষের হৃদয়ের পরিবর্তন করা যায় না।

কুলসম আর মানিকরাম পরস্পরের প্রতি তীব্রভাবে আকৃষ্ট হয়েছিল, তাদের মিলনও প্রায় হতে যাচ্ছিল, শেষ মুহূর্তে বাধা পড়ে যাওয়াও সেই আকর্ষণ আরও বেড়ে গেল। তারা প্রতি মুহূর্তে এখন পরস্পরকে চায়।

কিন্তু আর একবার চোখের দেখারও তো উপায় নেই।

বাড়ির বাইরে এক পাও যেতে পারে না কুলসম। তার ইচ্ছে করে পাখির মতন উড়ে যেতে। তাও তো পারে না, তাই সে শুধু ফুলে ফুলে কাঁদে।

সরল, নিষ্পাপ আর সদ্যফোটা ফুলের মতন সুন্দর কুলসম দিনে দিনে শুকিয়ে যেতে লাগল। এতদিন সে ছিল বাড়ির সকলের অতি আদরের, এখন তাকে কাঁদতে দেখলেই সবাই বকাঝকা করে। তাকে সান্ত্বনা দেবার কেউ নেই। এমনকী নওশের আলিও কুলসমের কান্না দেখলেই রেগে যান। সেই বিশ্বাসঘাতক কাফেরটার জন্য এখনও তার মেয়ে আদিখ্যেতা করবে। এ তিনি সহ্য করতে পারেন না।

কুলসমের বিয়ের ব্যবস্থা করার জন্য তিনি উঠেপড়ে লাগলেন।

মানিকরামেরও প্রায় একই রকম অবস্থা।

বাড়িতে সে প্রায় এক ঘরে হয়ে আছে। সত্য তো আর চাপা থাকে না। সে যে স্বেচ্ছায় মুসলমান হতে চেয়েছিল, তা লোকের মুখে মুখে ছড়িয়ে গেছে। আত্মীয়-পরিজনরা তার দিকে ঘৃণার দৃষ্টিতে তাকায়।

রাধামোহনও ঠিক করেছেন, এবার যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মানিকরামের বিয়ে দিতেই হবে। বিয়ে করলে তার মন বসবে সংসারে। চতুর্দিকে পাত্রীর সন্ধান চলছে।

মানিকরাম মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে বসে আছে, সে কিছুতেই বিয়ে করবে না। হিন্দু মেয়েদের আট-ন'বছর বয়েসেই বিয়ে হয়। এগারো ছাড়িয়ে গেলেই সে মেয়েকে বলা হয় অরক্ষণীয়া। ওই রকম কচি বয়েসের মেয়ে, যাদের মনে প্রেম-ভালবাসার কোনও বোধই জাগেনি, সে রকম একজনকে জীবন সঙ্গিনী করার কথা মানিকরাম কল্পনাই করতে পারে না। তার মন-প্রাণ জুড়ে আছে কুলসম। সে শুয়ে শুয়ে কুলসমের ধ্যান করে।

বাড়ির ছোটরা এত কিছু বোঝে না। বয়স্করা এখন মানিকরামকে অবজ্ঞা করলেও ছোটরা তাকে এসে টানাটানি করে। মধু যখন তখন তার ঘরে এসে বলে, ও ছোটাই দাদু শুয়ে আছ কেন ? ওঠো, গল্প বলো।

দিনের মধ্যে তবু কিছুটা সময় মানিকরাম কাটায় ছোটদের সঙ্গে। একদিন হঠাৎ শোনা গেল, কুলসমের বিয়ে হয়ে গেছে।

সুদূর মিরাটের এক ছোটখাটো জমিদারের ছেলের সঙ্গে এই বিয়ের ব্যবস্থা হয়েছে খুব দ্রুততার সঙ্গে। নওশের আলি মেয়েকে কাছাকাছি রাখতে চাননি। পাছে কেউ পুরোনো কথা ঘাঁটাঘাঁটি করে।

কুলসম এ গ্রামে আর কোনও দিন আসবে না। বিয়ের আগে পাত্রপক্ষ থেকে এই শর্তাদি দেওয়া হয়েছিল যে বধূকে তারা কোনওদিন বাপের বাড়িতে পাঠাবে না। তাদের বংশের এটাই প্রথা।

পীরগঞ্জ ছেড়ে কুলসম চলে গেল চিরকালের মতন।

খবরটা পেয়ে একরাত না ঘুমিয়ে শুধু কাঁদল মানিকরাম। তারপর সেও মনস্থির করে ফেলল।

ইদানীং মধুর শখ হয়েছে নৌকো চেপে বেড়ানোর। বাড়ির কাছেই কপোতাক্ষ নদী। সেখানকার ঘাটে দত্ত বাড়ির চার-পাঁচখানা নৌকো বাঁধা থাকে। মাঝিও আছে কয়েকজন। কিন্তু ছোটাই দাদু সঙ্গে থাকা চাই।

মানিকরাম প্রায় সকালেই মধুকে নৌকোয় খানিকটা ঘুরিয়ে আনে। সেদিন সকালে মানিকরাম প্রায় দুঘন্টা ধরে নৌকো চালাল। ভরা বর্ষায় কপোতাক্ষ নদীর জল টলটল করছে। ভেসে আসছে ছোট ছোট গাছের ডাল। দুপাশের ধানক্ষেতে বাতাস তুলে দিচ্ছে সবুজ তরঙ্গ। মাঝে মাঝেই চোখ ছলছল করছে মানিকরামের।

ঘাটে এসে নৌকো ভেড়াবার পর মানিকরাম মধুকে জিজ্ঞেস করলেন, কি আজ সন্তুষ্ট হয়েছিস তো ?

মধু ঘাড় নেড়ে বলল, হ্যাঁ, খুব ভালো লেগেছে।

মানিকরাম বলল, এবার নেমে বাড়ি চলে যা।

মধু জিজ্ঞেস করল, তুমি নামবে না ?

মানিকরাম বলল, আমার একটু কাজ আছে। ওপারে যাব। তুই ঠিক ঠিক বাড়ি যাবি কিন্তু।

মধু নামবার পর মানিকরাম ঘাট থেকে খানিকটা সরে গিয়ে চেঁচিয়ে বলল, মধু, আমার সঙ্গে তোর আর দেখা হবে না। আমি আর ফিরব না।

মধু চমকে গিয়ে বলল, ফিরবে না মানে ? কোথায় যাচ্ছ ? মানিকরাম বলল, আমি আর এ দেশে থাকব না। তুই ভাল থাকিস মধু, লেখাপড়া করিস মন দিয়ে, জীবনে উন্নতি হোক।

মধু কেঁদে ফেলে বলল, না, না, ছোটাইদাদু, তুমি যাবে না। তুমি যাবে না। মানিকরাম দুহাতে কান চাপা দিল। তার নৌকো ভাসতে ভাসতে চলল অন্য পারের দিকে।

কুলসম এখানে আর কখনও ফিরবে না। মানিকরামও দেশত্যাগ করল জন্মের মতন।

নদীর অন্য পারে গিয়ে নৌকোটা বেঁধে রেখে মানিকরাম হাঁটতে লাগল মাঠের মধ্য দিয়ে।

তখনও এদেশে রেলগাড়ি চালু হয়নি। নৌকো কিংবা গরুর গাড়িতে লোকে যাতায়াত করে। অধিকাংশ মানুষ যায় পায়ে হেঁটে। দিনের পর দিন মানিকরাম হাঁটতে লাগল।

রাত হলে কোনও মন্দিরের চাতালে শুয়ে পড়ে। সব মন্দিরেই কিছু না কিছু প্রসাদ পাওয়া যায়। কিংবা কোনও সম্পন্ন গৃহস্থ বাড়িতে গিয়ে দাঁড়ালেই তারা অতিথিকে খেতে দেয় যত্ন করে।

অর্থাৎ ভোজনং যত্রতত্র, শয়নং হট্টমন্দিরে। এইভাবে কয়েক মাস পরে মানিকরাম পৌঁছে গেল কাশী। কাশীতে প্রচুর সাধুদের আখড়া। এ এমনই এক দেশ, সাধু-সন্ন্যাসী, ফকির-দরবেশদের খুব মান্য করে সাধারণ মানুষ। এঁদের আহার ও মাথা গোঁজার ঠাঁই জুটে যায় ঠিক। মানিকরাম ঠিক করলেন, সে সত্যিকারের সন্ন্যাসী হবে। তার আর সংসারে মন নেই। গার্হস্থ্য জীবনেও সে আর কখনও ফিরে যাবে না। সে তার পরনের কাপড় গেরুয়া রঙে চুপিয়ে নিল। তারপর ভিড়ে গেল এক সাধুর আখড়ায়।

কিন্তু শুধু বসন রাঙালে তো হয় না, মন না রাঙালে যোগী হবে কী করে?

মানিকরাম চক্ষু বুজে ধ্যানে বসে, ঈশ্বরের চিন্তা করতে চায়, কিন্তু সে শুধু ভাবে কুলসমের কথা। মুদ্রিত চক্ষেও সে দেখতে পায় তার অনিন্দ্য সুন্দর মুখখানি। যে সাধুর আখড়ায় মানিকরাম আশ্রয় নিয়েছে, তাঁর নাম ত্রৈলঙ্গস্বামী। এঁর খুব নাম-ডাক। সারাদিন ধরে ভক্তরা আনাগোনা করে। ত্রৈলঙ্গস্বামী থাকেন আপন মনে। তাঁকে সব সময় দেখাও যায় না, কিন্তু তাঁর চ্যালারা গাঁজা খেয়ে আর গুলতানি করেই সময় কাটায়।

মাঝে মাঝে গানও হয়। তবে গানের চেয়ে কথা হয় বেশি। কিছুদিনের মধ্যেই মানিকরাম বুঝতে পারল, কিছুতেই তার চিত্তশুদ্ধি হচ্ছে না।

সন্ন্যাসীরা বলে বটে, তারা কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগী। কিন্তু বেশ কয়েকজনের কামিনী-কাঞ্চনের প্রতি যথেষ্ট লোভ আছে, তা মানিকরামের চোখে পড়ে যায়। আর এক একজন কী দারুণ পেটুক। চল্লিশখানা রুটি খায়, দশ সের দুধ এক চুমুকে শেষ করতে পারে।

লাড্ডু খেতে খেতে আর থামেই না। যারা এত খেতে ভালবাসে, তারা ঈশ্বর চিন্তা করবে কখন ?

কাশীতে বড় বেশি ভিড়। তাই সেখানে মানিকরামের মন টিঁকল না বেশিদিন ? গঙ্গার ধার দিয়ে সে আবার হাঁটতে শুরু করল। অনেক গ্রাম, অনেক জনপদ পেরিয়ে সে এক সময় পৌঁছে গেল হরিদ্বারে।

এই হরিদ্বারে আসলে হিমালয়ের প্রবেশদ্বার। বহু তীর্থযাত্রী প্রতি বছর এখান থেকে যাত্রা শুরু করে পাহাড়ি পথ ধরে কেদারনাথ মন্দিরে তীর্থদর্শনে যায়। অতি দুর্গম এই পথ। যারা যায় তারা অনেকেই ফেরে না। পথের মধ্যে মৃত্যু হলেও তারা মনে করে, সেটাই পরম পুণ্য।

হিমালয়ের অজস্র গিরি গুহা, তার মধ্যে থাকে অনেক সাধু। তারা আপন মনে ধ্যান করে। লোকালয়ে আসে না। তারা বনের ফলমূল খায়, নদীর ঝর্নার জলে তৃষ্ণা মেটায়। অনেক সময় তীর্থযাত্রীরা তাদের গুহার বাইরে কম্বল, গামছা ও কিছু কিছু শুকনো খাদ্যদ্রব্য রেখে যায়।

মানিকরাম এরকম একটা গুহায় আশ্রয়ে নিয়ে শুরু করল কঠোর তপস্যা। কুলসমকে ভুলতে না পারলে তার মুক্তি নেই।

সে দেখতে চায়, সত্যিই প্রাণমন দিয়ে ঈশ্বর চিন্তা করলে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় কি না, ঈশ্বরকে পাওয়ার মানেই বা কী ? কেউ বলে ঈশ্বর নানান রূপে বিরাজ করেন, কেউ বলে ঈশ্বর নিরাকার। ঈশ্বরের দর্শন পেলে মানুষ সংসার থেকে মুক্ত হতে পারে ? তাহলে তিনি এই সংসারে সৃষ্টি করেছেন কেন ? দিনের পর দিন মানিকরাম সেই গুহায় চোখ বুজে বসে থাকে। ভোরবেলা নদীতে স্নান করে সে সামান্য কিছু ফলমূল মুখে দেয়। আর সারাদিন সারারাত কিছুই খায় না। শীর্ণ হয়ে গেল তার শরীর।

কিন্তু কোনও দিব্য উপলব্ধি তার হল না।

চক্ষু বুজলেই বারবার এসে পড়ে কুলসমের মুখ। প্রতিদিন কুলসম যেন তার সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠ থেকে ঘনিষ্ঠতর হচ্ছে।

এক এক সময় সে তার শরীরে এক অসহ্য জ্বালা বোধ করে। যেন দুহাতে সে আলিঙ্গন করছে কুলসমকে। কুলসম মিশে যাচ্ছে তার শরীরে।

সেই সময় তার পুরুষাঙ্গ ইস্পাত দণ্ডের মতন দৃঢ় হয়ে যায়।

শরীরের এরকম জ্বালার সময় সে গুহা থেকে বেরিয়ে একটা আহত জন্তুর মতন ছুটোছুটি করে বনের মধ্যে আঃ আঃ আঃ বলে কাতর চিৎকার করে।

এক সময় সে নদীতে ঝাঁপ দিয়ে জ্বালা জুড়োয়।

ঈশ্বর দর্শন তো হলই না, বরং দিন দিন তার মনের মধ্যে একটা পাপ বোধ জন্মাতে লগল।

কুলসম এখন পরস্ত্রী, তার সম্পর্কে এরকম চিন্তা করাটা পাপ ছাড়া আর কী ? আর কেউ না জানতে পারুক, সে নিজের কাছে অপরাধী হয়ে যাচ্ছে।

কুলসমকে যদি আর কোনও উপায়েই ভুলতে পারা না যায়, তা হলে শুধু একটি মাত্র উপায়ই গ্রহণ করা যায়। নিজেকে এই পৃথিবী থেকে সরিয়ে ফেলা। তার এই অবৈধ কামনা যেন কোনওক্রমেই কুলসমকে স্পর্শ না করে। কুলসম সুখে থাকুক।

মনস্থির করে মানিকরাম একটা পাহাড়ের চূড়ায় উঠে দাঁড়াল। সামনেই বিশাল খাদ। অনেক নীচে জরির পাড়ের মতন দেখা যাচ্ছে অলকানন্দা নদী। তার দুপাশে বিস্তীর্ণ অরণ্য।

এখান থেকে ঝাঁপ দিলে সে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে।

মানিকরাম একবার আকাশের দিকে তাকাল। দিগন্ত পর্যন্ত যেন এক গাঢ় নীল মখমলের আস্তরণ। সমুদ্রের ঢেউয়ের মতন পরপর পর্বত শৃঙ্গ। শিখরের বরফের ওপর রোদ পড়ে ঝকঝক করছে চারদিক। কী অপরূপ মাধুর্যময় এই পৃথিবী। সজল, শ্যামল উদ্দান থেকে একটি ফুলগাছকে যেন কেউ উপড়ে এনে পুঁতে দিয়েছে মরুভূমিতে।

বাংলার গ্রাম থেকে কুলসম এসে পড়েছে সুদূর উত্তর ভারতের এক রুক্ষ ঊষর গ্রামে।

তার শ্বশুরবাড়ির যৌথ পরিবারের সদস্য সংখ্যা যে কত, তার গোনাগুনতি নেই। বিশাল এক হাবেলি, তার খোপে খোপে পায়রার মতন মানুষ। সব সময় কল-কোলাহল লেগেই আছে।

তিন মহলা হাভেলির মাঝ-মহলে একটা মস্ত বড় উনুনে সারা দিনরাত যেন রান্না চলতেই থাকে, খাওয়া-দাওয়াও চলে সারাদিন-রাত। যেন খাওয়াটাই বেঁচে থাকার একমাত্র উদ্দেশ্য।

এ বাড়ির পুরুষেরা কাঁধে বন্দুক নিয়ে বাড়ি থেকে বেরোয়। অল্প বয়েসি ছেলেরা উঠোনে তলোয়ার চালনা শেখে, বড় বড় পাথরের গেলাসে সিদ্দি আর ভাঙ খায়। সব ব্যাপারেই এই পরিবারটি যেন কুলসমের বাপের বাড়ির তুলনায় কয়েক শতাব্দী পিছিয়ে আছে।

এ বাড়ির স্ত্রী লোকেরা ঘরের মধ্যেও বোরখা পরে থাকে। অন্য কোনও পুরুষ, এমনকী স্বামীর বড় ভাই কিংবা বাবার সামনেও মুখ দেখাবার নিয়ম নেই। স্বামীর সঙ্গেও অধিক রাত্রি ছাড়া দেখা হয় না।

এ বাড়ির রমণীদের শুধু সন্তান উৎপাদন করাই একমাত্র কাজ। তাও পুত্র সন্তানের বদলে কন্যা সন্তানের জন্ম দিলে কান্নার রোল ওঠে। কোনও কোনও সদ্যজাত কন্যাকে কোথায় যেন নিয়ে যাওয়া হয়, আর তাকে দেখা যায় না পরে কখনও।

কুলসমের শ্বশুরের চারটি বিবি, সন্তান সংখ্যা উনিশ। কুলসমের স্বামী ইদ্রিশ এই সন্তানদের মধ্যে সপ্তম। সে একজন লম্বা চওড়া সুপুরুষ, শারীরিক শক্তি ও সাহসের জন্য তার খ্যাতি আছে। কোনও দুর্বিনীত প্রজাকে শাস্তি দিতে হলে সেই ভার পড়ে ইদ্রিশের ওপর। সে শুধু সেই প্রজার একটা হাত মুচড়ে ভেঙে দেয়।

আশেপাশে গ্রামের মানুষ অধিকাংশই খুব গরিব। সেই তুলনায় এই জমিদার পরিবার অত্যন্ত ধনী। টাকা-পয়সা, সোনা-দানা বাড়ির মধ্যে অবহেলায় ছড়ানো থাকে। তবে, এ অঞ্চলে মেয়ের সংখ্যা খুব কম বলে বিয়ের জন্য সুন্দরী পাত্রী খুঁজতে যেতে হয় দূর দূর অঞ্চলে। এমনকী বাংলাদেশ থেকেও ভাল মুসলমান পরিবারের মেয়েদের এরা বউ করে আনে।

কুলসম নিজের স্বামীকেই এখনও ভাল করে চেনে না। এদের ভাষাও তার কাছে দুর্বোধ্য। সারাদিন সে কী যে করবে, ভেবেই পায় না। একেবারে কিছুই করার নেই। বাড়ির বাইরে যাওয়ার তো কোনও প্রশ্নই নেই, এমনকী বাইরের কিছু দেখাও যায় না। তার বরাদ্দ একটি মাত্র ঘর। এছাড়া এই তৃতীয় মহলে রয়েছে একটা মস্ত বড় চতুষ্কোণ চাতাল, এখানে শীতের সকালে বাড়ির মেয়েরা বসে রোদ পোয়ায়। দিনের বেলা পুরুষরা এদিকে আসে না।

অন্য মেয়েরা পরস্পর গল্প-গুজব করে, তাদের সঙ্গে যোগ দিতে পারে না কুলসম।

সমস্ত রকম গান-বাজনা এ পরিবারে নিষিদ্ধ।

কুলসম বেশ কয়েকটা গান শিখেছে। তার বুকের মধ্যে সেই গানগুলো ছটফট করে, কিন্তু গলায় তোলার উপায় নেই। একদিন সে ঘরের মধ্যে গুনগুন করে গান গেয়ে

ফেলেছিল, তা শুনে একটি অল্প বয়েসি মেয়ে অবাক হয়ে চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে ছিল। আকারে ইঙ্গিতে সেই মেয়েটি বোঝাতে চেয়েছিল, আর একটু গাও। আর একটু শোনাও।

কিন্তু কুলসম বুঝতে পেরেছিল, আর কেউ যখন গান গায় না, তখন তার পক্ষেও গান করা বিপজ্জনক। ধরা পড়লে শাস্তি পাবে। তাই সে সাবধান হয়ে গেছে।

কিন্তু গান যার বুকের মধ্যে বাসা বেঁধেছে, সে আর কখনও গান বাদ দিতে পারবে না। বুকের মধ্যেই সে গান গুমরে মরে। বাইরে থেকে কেউ বুঝতে পারে না। সে নীরব গান গাইছে।

বাপের বাড়ির কথা ভাবলেই তার চোখে জল আসে। সেখানে কড়াকড়ি থাকলেও এতটা নয়। বাড়ির ছাদে উঠে দেখা যেত প্রকৃতি। পুকুরে স্নান করতে যাওয়ার অনুমতি ছিল। নৌকো বাইচের প্রতিযোগিতাও দেখতে যেত নদীতে।

বাপের বাড়ির কথা ভাবতে গেলেই মনে পড়ে সেই সুদর্শন গায়কটির কথা। আড়াল থেকে তার গান শোনা আর শেখা, বড় আনন্দে কেটেছিল কয়েকটি মাস। কী সুন্দর সে গান করে। গানের সঙ্গে সঙ্গে গায়কটিকেও তার ভাল লেগে যায়। সেই গায়কটির সঙ্গে বিয়ে হলে কুলসম থেকে যেতে পারত বাংলাদেশে, নিজের চেনা পরিমণ্ডলে। আর সব রকম যোগ্যতা থাকলেও একটি অযোগ্যতা ছিল সেই গায়কটির। সে মুসলমান নয়। কিন্তু এ অযোগ্যতার কথা খেয়াল করার আগেই যে তাকে মন দিয়ে ফেলেছিল কুলসম।

একবার মন দিয়ে দিলে তা ফিরিয়ে নেওয়া যে কত কঠিন। কিছুতেই তাকে ভোলা যাচ্ছে না। যখন তখন মনে পড়ে তার মুখ, কানে ভেসে আসে তার গান। তখনই কুলসমের বুকটা মুচড়ে মুচড়ে ওঠে।

সন্ধের পর থেকেই সেজেগুজে তৈরি হয়ে থাকতে হয় স্বামীর জন্য। এ বাড়ির অন্য মেয়েরাই তাকে সাজতে শিখিয়েছে বিশেষভাবে। আতর মাখতে হয় কানের লতিতে, চন্দনের ফোঁটা দিতে হয় স্তনবৃন্তে।

ইদ্রিশ সাধারণত আসে গভীর রাতে। সিদ্দি, ভাং, মদ এইসব নেশাই তার চলে। কুলসমের বাপের বাড়িতে মদ্যপানের একেবারেই চল ছিল না। কোনওদিন সে মাতাল দেখেনি। এই বাড়িতে ইসলামের সব অনুশাসন কঠোরভাবে মানা হলেও এই একটি ব্যাপার বাদ। এমনকী মেয়েরাও একটু একটু সুরা পান করে। কুলসমের এই গন্ধটাই সহ্য হয় না।

ইদ্রিশ কিন্তু তার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে না। মানুষটা গম্ভীর প্রকৃতির। কথাই বলে কম। প্রতিদিনই সে কুলসমকে জিজ্ঞেস করে, তোমার কোনও অসুবিধা হচ্ছে না তো? কুলসম বলে, না। ব্যাস, এই পর্যন্তই।

এক একদিন ইদ্রিশ শুয়ে পড়েই নাক ডাকতে শুরু করে। এক একদিন সে মাঝরাতে উঠেও কুলসমের শরীর সম্ভোগ করতে চায়।

সে কুলসমকে ব্যথা দেয় না, নিষ্ঠুর আচরণ করে না, শুধু নিজের উপভোগটাই তার কাছে প্রধান। প্রেম-ভালবাসা বা সোহাগের কথা যে বলতে হয়, তা সে জানেই না। বিয়ে করা হয়েছে তো পরিবারের সদস্যা সংখ্যা বাড়াবার জন্য।

কুলসম তার স্বামীকে সাধ্যমতন সুখ দিতে চায়। তবে, ইদ্রিশের নিশ্বাসে মদের গন্ধে তার গা গুলিয়ে ওঠে, তখন সে অন্য কোনও দিকে মনটাকে ফিরিয়ে রাখে।

এক বছরের মধ্যেই গর্ভবতী হল কুলসম এবং শ্বশুরবাড়ির সকলের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করে জন্ম দিল একটি পুত্র সন্তানের।

সেই সময় সেও ভুগতে লাগল সূতিকা রোগে। গর্ভবতী মেয়েদের এ রোগ ধরলে বাঁচার সম্ভাবনা খুবই কম। চিকিৎসার উপায় নেই, কারণ অন্ত:পুরের মেয়েদের পুরুষ ডাক্তার-হেকিম-বদ্যি দেখাবার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। মেয়ে-ডাক্তার আর কোথায় পাওয়া যাবে।

অনেক সময় নানারকম শেকড়-বাকড়, জড়ি-বুটি দেওয়া হয়, তাতে নেহাত আয়ুর জোর থাকলে দুএকজন বাঁচে। সদ্যোজাত সন্তানটিকে নিজের বুকের দুধ খাওয়ানোর ক্ষমতাও রইল না কুলসমের, সে মুমূর্ষু অবস্থায় পড়ে রইল বিছানায়। তার ছেলের দেখাশুনা করতে লাগল অন্য নারীরা।

শেষ পর্যন্ত যেন ভাগ্যের জোরেই বেঁচে গেল কুলসম। প্রায় ছ-মাস ভুগে সে সুস্থ হয়ে উঠল। বাজরার রুটি আর গোস্ত হজম করার শক্তি ফিরে পেল। তার গলার আওয়াজ চিঁ চিঁ হয়ে গিয়েছিল, এখন একটু জোর আসায় সে কাতরভাবে তার পরিচর্যাকারিণীকে বলল, আমার ছেলেটাকে একবার আমার কোলে দেবে না ?

মেয়েটি কুলসমের শিশুপুত্রকে এনে শুইয়ে দিল তার পাশে। এই প্রথম বলতে গেলে কুলসম ভাল করে দেখল তার ছেলের মুখ।

দারুণ চমকে উঠল সে, ভয়ে কাঁপতে লাগল তার বুক।

ছেলের মুখ অবিকল যেন মানিকরামের মুখখানা বসানো। সেই চোখ, সেই নাক, সেই থুতনি।

কী করে হল এমন ? মানিকরামের কথা সে কতবার তন্ময় হয়ে ভেবেছে। এমনকী স্বামীর সঙ্গে সঙ্গমের সময়ও মনে পড়েছে সেই গায়কটির মুখ।

এই ছেলে তার অতৃপ্ত বাসনার সন্তান।

ছি ছি, এ যে পাপ। এ যে চরম অন্যায়। কিন্তু কুলসম কী করবে ?

মনকে দমন করার কি কোনও ওষুধ আছে ?

এখানে কেউ অবশ্য বুঝতে পারবে না। কুলসম কোনওদিন তার ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে যাবে না বাংলাদেশে। এ ব্যাপার শুধু কুলসমের কাছেই গোপন থাকবে।

মায়ের কোল পেয়ে ছেলেটা খলখল করে হাসছে। কুলসম চুমোয় চুমোয় ভরিয়ে দিল তার মুখ।

ছোটাই দাদুর দেশত্যাগের পর মধুকে সামলানো একেবারে অসম্ভব হয়ে পড়ল।

সে কেঁদেকেটে, চিৎকার করে অস্থির করে তুলল সারা বাড়ি। ছোটাই দাদুকে ফিরিয়ে

আনতে হবে। না হলে মধু কিছু খাবে না, পড়াশুনো করবে না, পাঠশালায় যাবে না।

মানিকরামের অনেক খোঁজ করা হয়েছে চতুর্দিকে। কোথাও তার কোনও রকম সন্ধান পাওয়া যায়নি। তার দাদা ও ভাইপোরা হাল ছেড়ে দিয়েছে।

শেষ পর্যন্ত মধুকে পাঠিয়ে দেওয়া হল কোলকাতায়।

মধুর বাবা রাজনারায়ণ দত্ত এখন কোলকাতার প্রসিদ্ধ উকিল, প্রচুর তাঁর উপার্জন। এতদিন তিনি কোলকাতায় বাসা ভাড়া করে থাকতেন, তারপর একটি বড় বাড়িও কিনেছিলেন, স্ত্রী ও পুত্রকে রেখেছিলেন গ্রামে। সেটাই পারিবারিক প্রথা।

এবারে তার স্ত্রী জাহ্নবি মধুকে সঙ্গে নিয়ে চলে এলেন খিদিরপুরের সেই প্রাসাদোপম বাড়িতে।

মধুকে শান্ত করতে কয়েকটা দিন সময় লাগল। অবশ্য, কোলকাতায় এত মানুষজন, এত গাড়ি-ঘোড়া দেখে সে হকচকিয়ে গিয়েছিল। কোথায় সাগরদাঁড়ি গ্রাম আর কোথায় ইংরেজদের রাজধানী কোলকাতা।

এখানে মধুকে ইস্কুলে ভর্তি করতে হবে। দেশের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম হিন্দু কলেজ। নামে কলেজ হলেও সেখানে বিদ্যালয়ের পাঠ থেকেই শুরু। কিন্তু কিছু অন্তত ইংরেজি না জানলে মধুকে ভর্তি হতে হবে একেবারে নিচু ক্লাসে।

গ্রামের পাঠশালায় মধুর কত দূর কী শিক্ষা হয়েছে, তা পরীক্ষা করে দেখলেন রাজনারায়ণ। ছাত্র হিসেবে তো মধু খুবই মেধাবী, রামায়ণ-মহাভারতের অনেকখানিই তার মুখস্ত, সে কিছুটা ফারসি শিখেছে, কিছুটা সংস্কৃত, কিন্তু পাঠশালায় ইংরেজি শেখাবার কোনও ব্যবস্থা ছিল না। রাজনারায়ণের বাস্তব বুদ্ধি অতি তীক্ষ্ম, তিনি বুঝেছিলেন, দিন দিন ইংরেজদের প্রতিপত্তি যেমন বাড়ছে, তাতে এ দেশে নবাবি শাসনের আর আশা নেই। ইংরেজরাই রাজ্য চালাবে। তখন ফারসি ভাষার কদরও কমে যাবে, তার স্থান নেবে ইংরেজি। সুতরাং ছেলেকে ভাল করে ইংরেজি শেখাতেই হবে।

রাজনারায়ণ খিদিরপুরেই এক সাহেবের নিজস্ব ছোট স্কুলে ভর্তি করে দিলেন মধুকে।

গ্রামের ছেলে শহরে এলে প্রথম প্রথম নানা অসুবিধেয় পড়তে হয়। প্রধান অসুবিধে হয় ভাষা নিয়ে।

মধু কোলকাতার ভাষা একেবারেই জানে না, তার মুখে খাঁটি যশুরে বাংলা ভাষা। সে

ভাষা শুনে তার সহপাঠীরা হাসে, তার মাথায় চাঁটি মেরে তাকে ক্ষেপায়।

এক একদিন মধু অস্থির হয়ে চিৎকার করে ওঠে, পুঙ্গির বাই বাঙাল বাঙাল সব্যা মস্তক শুরাই দিচে -- বাঙাল কউস ক্যান ?

তাতে ছেলেরা খলখলিয়ে হেসে ওঠে -- তাকে চাঁটি মারতে মারতে বলে পুঙ্গির বাই। পুঙ্গির বাই মানে কী রে ?

মধুর চোখে জল এসে যায়।

গ্রামের বাড়িতে তার কত আদর ছিল, পাঠশালায় সে ছিল সেরা ছাত্র। তাছাড়া পাঠশালাটা তারই ঠাকুরদার তৈরি করা, গুরুমশাই পর্যন্ত সে জন্য খাতির করতেন তাকে।

এখানে তাকে কে চেনে ?

তার মনে পড়ে গ্রামের কথা। বাড়ির পাশের পুকুর, কপোতাক্ষ নদী, দিগন্ত বিস্তৃত ধানের খেত, পাট খেত, আম, জাম, কাঁঠাল, জাম্বুরা গাছ, ছিপ দিয়ে মাছ ধরা ...।

কোলকাতা তার ভাল লাগে না। ছোটাই দাদু নিরুদ্দেশ না হলে সে গ্রাম ছেড়ে আসতই না।

বাংলা ভাষা, বাঙাল উচ্চারণ কিছুতেই ঘোচাতে পারে না বলে মধু সারাদিন ধরে ইংরেজি মুখস্ত করে। সাহেব মাস্টারের কাছে ইংরেজি উচ্চারণ শেখে।

এখন শুধু ইংরেজিতে কথা বললে কেউ আর তাকে বাঙাল ভাববে না। বাঙাল ভাষা আড়াল করার জন্যে মধু মাতৃভাষা বাংলাই ত্যাগ করতে শুরু করল।

ছেলের দ্রুত উন্নতি দেখে রাজনারায়ণ তাকে নিয়ে এলেন হিন্দু কলেজে। এখানেও তার ইংরেজি শুনে সহপাঠীদের তাক লেগে যায়।

সাগরদাঁড়ি গ্রামের মধু এবারে হল মধুসুদন দত্ত। ক্লাসের ছেলেদের সে বলে, আমাকে মধু বলে ডাকবি না। বলবি এম এস ডাট।

মধু ভর্তি হবার আগে এই হিন্দু কলেজের একজন শিক্ষক ছিলেন ডিরোজিও। তিনি বড় বংশের কচি কচি ছেলেদের মাথাগুলি চিবিয়ে খেয়েছিলেন, অবশ্য তাঁর নিজের বয়েস বেশি ছিল না। ডিরোজিও শুধু যে শিক্ষক হিসেবে ছাত্রদের কাছে প্রিয় ছিলেন তাইই নয়। তিনি তাদের মাথায় ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন নতুন ধরনের চিন্তা। ধরা বাঁধা বিশ্বাসের বদলে

যুক্তিবাদ। কুসংস্কার থেকে মুক্ত হয়ে সত্যকে আবিস্কার করার চেষ্টা।

মুসলমান ছাত্ররা তখনও ইংরেজি শিখতে শুরু করেনি। এই কলেজের অধিকাংশ ছাত্রই হিন্দু। সুতরাং হিন্দু ধর্মের নানান কুসংস্কার ও প্রথা সম্পর্কে প্রশ্ন ওঠে। এর ফলে ডিরোজিওর ছাত্ররা পশ্চিমী পৃথিবীর আধুনিকতার সঙ্গে পরিচিত হয়।

তবে, যারা সদ্য ধর্ম বদলায় তারা যেমন গোঁড়া ধার্মিক হয়, সেই রকম এইসব আধুনিক চিন্তা ধারার সঙ্গে যুক্ত হয়ে ছাত্ররা নিজেদের দেশের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কেও বিরূপ হয়ে ওঠে। কেউ কেউ বাপ-ঠাকুর্দার ধর্ম ও সংস্কার সম্পর্কে প্রকাশ্যে ঘৃণা প্রকাশ করতে থাকে। সবাইকে দেখিয়ে দেখিয়ে গরুর মাংস ও মদ খাওয়াকে আধুনিকতার পরাকাষ্ঠা মনে করে, অনেকে ধর্ম বদল করে খ্রিষ্টানও হয়ে যায়।

গোঁড়া হিন্দু ও অভিভাবক শ্রেণী এসব সহ্য করবে কেন? তারা অভিযোগ আনে সব নষ্টের গোঁড়া ডিরোজিওর নামে। ফলে কলেজ থেকে তাঁর চাকরি যায়। এরপর ডিরোজিও হঠাৎ মারাও যান মাত্র তেইশ বছর বয়েসে।

মধুসুদন এই ডিরোজিওর ছাত্র হল না বটে, কিন্তু তখনও ডিরোজিও প্রভাব রয়ে গেছে একদল তরুণের মধ্যে। তারা পত্রপত্রিকা প্রকাশ করে। ডিরোজিওর আদর্শ প্রচার করে। ডিরোজিওর কবিতাগুলোও তরুণদের মধ্যে জনপ্রিয়।

মধু এই আদর্শে প্রভাবিত হল বেশি বেশিভাবে। বাঙাল উচ্চারণ ঢাকবার জন্যে সে যেমন ইংরেজি ছাড়া কথা বলে না, সেই রকম গ্রাম্যতা ঢাকবার জন্যও তাড়াতাড়ি হয়ে উঠতে লাগল সাহেব। প্যান্ট-কোর্ট ছাড়া অন্য কিছু পরে না। কাঁটাচামচ ছাড়া খাবার খায় না। চুলোয় গেল রামায়ণ-মহাভারত, সে ইংরেজি সাহিত্য ছাড়া আর কিছু পড়ে না এখন, ইংল্যান্ডের এক অতি উচ্ছৃঙ্খল ও নষ্ট চরিত্রের বায়রন তার চোখে দেবতার মতন।

সাগরদাঁড়ি গ্রামের দশ-এগারো বছরের মধুকে যারা দেখেছে, তারা এখন পনের-ষোল বছরের, কোলকাতার মধুকে দেখলে চিনতেই পারবে না।

সে এখন ইংরেজিতে কবিতা লেখার চেষ্টা করে। তার একমাত্র সাধ এই পচা দেশ ছেড়ে ইংল্যান্ডে গিয়ে থাকা। সাহেব সাজার জন্যে এই বয়সেই মদ্যপান শুরু করেছে। তাদের বাড়িতে পাঁঠার মাংস রান্না হয়, কিন্তু গরুর মাংস বা মুরগি ঢোকেনি, সে সময় মুরগিও হিন্দু বাড়িতে অচ্ছুৎ ছিল। মধু দোকানে গিয়ে সে সব মাংস খায়, বন্ধুদের খাওয়ায়, সে টাকা খরচ করে দুহাতে।

ছেলে লেখাপড়ায় ভাল, কলেজের পরীক্ষায় স্বর্ণপদক পায়, এ জন্য রাজনারায়ণ খুশি। কিন্তু অন্যদিকে তার মতিগতি দেখে চিন্তিতও বটে। দেব-দ্বিজে ভক্তি নেই তো বটেই, এমনকী গুরুজনদের শ্রদ্ধা করে না, মা ছাড়া আর কারো প্রতি টান নেই। তিনি ভাবলেন, ছেলের বিয়ে দিলেই সে অনেকটা শুধরে যাবে, সংসারে মতি হবে।

এক ধনী কন্যার সঙ্গে বিয়ে ঠিকও হয়ে গেল, কিন্তু তা শুনে মধু রাজি হবার বদলে খেপে উঠল একেবারে।

সাহেবদের মতন সে আগে নিজে পছন্দ করা মেয়ের সঙ্গে প্রেম করবে, তারপর তাকে বিয়ের প্রস্তাব দেবে -- এরকম সে অনেক আগেই ঠিক করে রেখেছে। বাবা-মায়ের পছন্দ করা একটা কচি খুকিকে বিয়ে করবে এম এস ডাট ? অসম্ভব।

এই বিয়ে এড়াবার উপায় ভাবতে মধুর মাথায় একটা ফন্দি এসে গেল।

বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়ে আলাদাভাবে কোথাও থাকা তার পক্ষে সম্ভব নয়। খরচ জোগাড় হবে কী করে। তার তো কোনও উপার্জন নেই। বাবা তাকে এখন বহু টাকা হাত খরচ দেয়। বাবার অবাধ্য হলে সব বন্ধ হয়ে যাবে। তার বদলে খ্রিস্টান হয়ে গেলে কী হয় ? একবার খ্রিস্টান হলে আর কোনও হিন্দু মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হবে না। হিন্দু ধর্মে ফিরে আসাও যাবে না।

খ্রিস্টান হতে চাইলে মিশনারিরা লুফে নেবে। তারা আশ্রয় দেবে। তারা বিদেশে থাকারও ব্যবস্থা করে দিতে পারে।

চুপি চুপি সব ব্যবস্থা করল মধু। ঘনিষ্ঠ বন্ধুদেরও কিছু জানাল না। একদিন সে এক মোহর খরচ করে ফিরিঙ্গিদের ধরনে চুল ছাঁটিয়ে এল কলেজে। বন্ধুরা হঠাৎ তার মুখের এই নতুন আকৃতিতে অবাক হলে মধু মুচকি মুচকি হাসে শুধু।

পরদিনই সে বাড়িতে কাউকে না জানিয়ে আশ্রয় নিল ফোর্ট উইলিয়ামে।

খবর শুনে রাজনারায়ণ ছেলেকে উদ্ধার করার জন্য অনেক চেষ্টা করেছিলেন, এমনকী লাঠিয়াল পাঠিয়ে দুর্গ থেকে মধুকে কেড়ে আনার কথাও ভেবেছিলেন। কিন্তু প্রতিপক্ষ এখানে ইংরেজ, নবাব-বাদশারাও তাদের কাছে হার স্বীকার করেছে।

কিছুই করা গেল না। যথাসময়ে খ্রিস্ট ধর্মে দীক্ষা হয়ে গেল মধুর। তার নতুন নাম হল মাইকেল।

শেষ পর্যন্ত পাহাড় চূড়া থেকে ঝাঁপ দিতে পারেনি মানিকরাম। এই বিশ্বপ্রকৃতির রূপ সুধা ও লাবণ্য তাকে পিছে টেনে রেখেছে।

কয়েকদিন সে ঝিম মেরে বসে রইল।

সে বেঁচে থাকার আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছে, অথচ মৃত্যুবরণ করার মতন মনোবলও সংগ্রহ করতে পারছে না।

আর এই গুহার মধ্যেই থাকার বা কী মানে হয় ? তপস্যা বা ধ্যানেও তো তার আর বিশ্বাস নেই।

পাহাড় ছেড়ে আবার নেমে এল সমতলে।

আবার হাঁটতে লাগল উদ্দেশ্য হারার মতন। দিনের পর দিন।

হয়তো একেবারে উদ্দেশ্য হারা নয়। অবচেতনে একটা বিশেষ লক্ষ্যস্থল ছিল, ঘুরতে ঘুরতে সে এসে পৌঁছল মিরাটে।

সে বেশ অবাক হল, সে ভাবল, নিয়তি তাকে এখানে টেনে এনেছে। এই মিরাটেই তো কুলসমের শ্বশুরবাড়ি।

নিরিবিলি জায়গা দেখে একটা গাছতলায় সে বসল ধুনি জ্বালিয়ে। অঞ্চলটি মুসলমান প্রধান, কিছু হিন্দু এবং শিখও বাস করে পাশাপাশি। শুধু সন্ন্যাসী কিংবা ফকির-দরবেশদের মতন সংসারত্যাগীদের প্রতি সকল ধর্মেরই সাধারণ মানুষদের ভক্তি শ্রদ্ধার ভাব আছে। যত ঝগড়া বিবাদ পুরুত আর মোল্লাদের মধ্যে, যারা ধর্মের প্রতিনিধি হয়েও সাংসারিক স্বার্থ ভুলতে পারে না।

সাধু-সন্ন্যাসীদের সঙ্গে মিলে মিশে মানিকরাম কিছুটা জ্যোতিষশাস্ত্র শিখেছে। মানুষের হাতের রেখা দেখে অতীত-ভবিষ্যৎ গণনা করে, কিছুটা মেলে, কিছুটা মেলে না, তাতেই লোকের বিশ্বাস অটল থাকে।

নানান লোকজন আসে, তাদের মুখ থেকে অনেক খবর শোনা যায়। মানিক এক সময় জেনে গেল যে শিবপুরের জমিদার মির্জা মহম্মদের বাড়িতে একটি বাঙালি বিবি আছে।

সে এমনই ভাগ্যবতী যে প্রথমেই একটি পুত্র সন্তানের জন্ম দিয়েছে। ওই পরিবারে বেশিরভাগই মেয়ে জন্মায়।

মানিকরাম মনে মনে ভাবে, একবার কি কুলসমের দেখা পেতে পারে না ? শুধু চোখের দেখা, দূর থেকে ?

মির্জা মহম্মদের হাভেলির আশেপাশে দু-একবার ঘোরাফেরা করে মানিকরাম বুঝল, তার এ আশা একেবারেই দুরাশা। ও বাড়ি একেবারে নিশ্ছিদ্র দুর্গের মতন। নারীরা অসূর্যস্পর্শা।

তৃষ্ণার্ত চাতকের মতন মানিকরাম সে বাড়ির দিকে চেয়ে থাকে আর দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

এরকমভাবে কেটে গেল তিনটি মাস।

একদিন দেখা গেল শিবপুরের মির্জা মহম্মদের বাড়ি থেকে সারি বেরিয়ে আসছে ডুলি আর পালকি। পাশাপাশি কয়েকজন পুরুষ চলছে ঘোড়ায়। সে বাড়ির লোকেরা তীর্থযাত্রায় যাচ্ছে আজমিরে।

ডুলি-পালকিগুলো এমনভাবে কাপড় দিয়ে ঘেরা যে ভেতরের জেনানাদের পায়ের পাতা কিংবা চুলের ডগাও দেখার উপায় নেই। ওদের মধ্যে কুলসম আছে কিনা, তা বোঝা যাবে না। তবু মানিকরাম ঠিক করল, সেও যাবে আজমির।

ওদের ঠিক অনুসরণ করা যায় না। ডুলি-পালকি বাহকদের গতি হয় দ্রুত।

মানিকরামের অনেক আগেই ওই দলটি আজমির পৌঁছে গেল। কয়েকদিন সমানে হেঁটে ক্লান্ত, ধূলি ধূসরিত অবস্থায় মানিকরাম পড়ল আর এক আতান্তরে।

ওরা কোথায় উঠেছে, সে বুঝবে কী করে ?

এক একবার নিজেকেই প্রশ্ন করছে, কেন সে অন্ধের মতন অনুসরণ করছে কুলসমকে ? কী লাভ ?

আবার নিজেই উত্তর দিচ্ছে, একবার শুধু চোখের দেখা। তারপরই সে মুক্তি পেয়ে যাবে। এ তো এক রকমের মোহ। এ মোহ কাটাবার আর কোনও উপায় তো সে ভেবে পাচ্ছে না।

সেই সময়ে তীর্থ দর্শনে কোনও রকম তাড়াহুড়ো থাকত না। আসতে এবং যেতে সময়

লেগে যেত বেশ কয়েকদিন। আজমির শরিফে অনেকে একমাস-দুমাসের জন্যও বিশেষ মানত নিয়ে আসে।

আজমির শরিফের বাইরে রাস্তায় দীর্ঘ সার বেধে বসে থাকে ভিখারিরা। অনেক দূর দূর দেশ থেকে তারা আসে। এখানে ভিক্ষা দানেও পুণ্য হয়। তাই ধনী মানুষেরা প্রত্যেক ভিখারিকেই কিছু না কিছু দেয়।

মানিকরামও সেই ভিখারিদের পংক্তিতে বসে পড়ল।

তার এখন মুখ ভর্তি দাড়ি, মাথায় বড় চুল, হিন্দু না মুসলমান, তা চেনার উপায় নেই। অবশ্য আজমির শরিফে হিন্দু তীর্থযাত্রীরাও আসে। এখানে আর পালকি-ডুলি নয়, মহিলাদেরও যেতে হয় পায়ে হেঁটে। অধিকাংশের বোরখাতে সর্বাঙ্গ ঢাকা। দক্ষিণ ভারতের অনেক মুসলমান রমণী অবশ্য বোরখা ব্যবহার করে না, তারা মাথা ঢেকে রাখে একটা কালো ওড়নায়। সে সব কিছুই না থাকলে চেনা যায় হিন্দু রমণীদের। তারা শাড়ির আঁচলটাই মাথায় রাখে।

যাওয়া আসার পথে তীর্থযাত্রীরা ভিখারিদের একটা আধটা পয়সা দিয়ে যায়। মানিকরাম তীক্ষ্ম চোখে তাদের পর্যবেক্ষণ করে। বোরখার আড়াল থেকে দেখা যায় শুধু দুটি চোখ, সেই চোখ দেখে সে চেনার চেষ্টা করে।

কুলসমকে সে সশরীরে তো দেখেছে মাত্র একবার। দিনের পর দিন তো শুধু চোখ দুটোই দেখেছে। প্রতিদিন যারা যায়, তাদের মধ্যে একজনের চোখ দেখে মনে হয় যেন এই-ই সে। নি:সন্দেহ হতে পারে না। সে রমণীটি থাকে অন্তত তিন-চার জনের সঙ্গে, থামেই না বলতে গেলে। তার হয়ে অন্য একজন পয়সা ছুঁড়ে দেয়।

সে রমণীর তলপেট বেশ উঁচু, মনে হয় যেন গর্ভবতী। আসন্ন প্রসবা। এক একদিন তার সঙ্গে আসে একটি বছর চারেকের বালক।

সে রমণী যদি একদিন অন্তত কয়েক মুহূর্তের জন্যও দাঁড়াত তার সামনে। তা হলে শুধু চোখ দেখে নিশ্চিত চিনে নিত মানিকরাম। কিন্তু সে তো এখানে একজন ভিখারি, সে উঁচু ঘরের একজন মহিলাকে দাঁড়াতে বলবে কী করে?

কয়েকটা দিন কেটে গেল এভাবে। তা হলে কি এখানেও দেখা হবে না?

কুলসমও চিনতে পারবে না মানিকরামকে। ঘন দাঁড়ি-গোঁফে যে তার মুখ প্রায় ঢাকা।

একদিন মানিকরাম দেখল, খানিক দূর থেকে আসছে সেই গর্ভবতী রমণী, অন্য কয়েকজনের সঙ্গে। আজ বালকটিও রয়েছে পাশেপাশে।

ভিখারিরা নানা রকম করুণ সুরে আবেদন জানায়। কেউ কেউ কপাল চাপড়ে কাঁদে, কেউ কেউ গান গায়, কেউ কেউ নিজের গায়ের রঙ করা একটা ক্ষতস্থান দেখায়।

সেই দলটি যখন কাছে এসে পড়েছে, মানিকরাম হঠাৎ গান গেয়ে উঠল। অনেক দিন সে গান গায়নি, এ গান যেন স্বতোৎসারিত।

আজু রজনী হম ভাগে পোহায়লুঁ
পেখলুঁ পিয়া মুখ চন্দা
জীবন যৌবন সফল করি মানলুঁ
দস দিস ভেল নিরদন্দা ...।

অমনি থমকে গেল সেই গর্ভবতী রমণী। দাঁড়িয়ে পড়ল গায়কটির সামনে এসে। মানিকরাম ওপরের দিকে তাকিয়ে দেখল, হ্যাঁ, কোনও ভুল নেই। এই সেই চোখ।

চোখ দুটো কি জলে ভরে গেল ? ওর শরীর কি কাঁপছে থরথর করে ?

কুলসম জড়িয়ে ধরল তার ছেলেকে। কালো সিল্কের বোরখার ভেতর থেকে সোনার বর্ণের একটি হাত।

এক জায়গায় বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার কথা নয়। সঙ্গিনীরা ঠেলছে কুলসমকে। সে এখুনি চলে যাবে। মানিকরাম তার চোখ দেখেছে, তার একটা হাতও দেখেছে, আর কী চাই ?

তবু আশা মেটে না।

সত্যিকারের ভিখারির মতন হাত বাড়িয়ে সে ব্যাকুলভাবে বলল, দাও, আমাকে কিছু দাও।

কুলসমের অন্য হাতে ছিল একটা মানতের ফুল। কিছু খুচরো পয়সার সঙ্গে সেই ফুলটা সে ফেলে দিল মানিকরামের সামনে।

তারপর চলে গেল দ্রুত পায়ে।

পরদিন আর কুলসম এল না, সেই দলটির সঙ্গে। সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত প্রতীক্ষায় বসে থাকে। তারপর সে ভিক্ষে পাওয়া পয়সা অন্য ভিখারিদের মধ্যে বিলিয়ে দেয়।

কুলসমের সঙ্গে আর দেখা হল না তার।

দ্বিতীয় সন্তানের জন্ম দিতে গিয়ে তার আর জ্ঞান ফিরল না। মৃত্যুর কয়েক মুহূর্ত আগে তার ঠোঁট নড়ছিল একটু একটু। সে নিঃশব্দে একটা গান গাইছিল বোধহয়।

খ্রিস্টান পাদ্রিদের সহায়তায় মধু সাগর পাড়ি দিয়ে তার স্বপ্নের দেশ ইংল্যান্ডে যাবে আশা করেছিল, সে আশা তার সফল হল না। কোনও কোনও পাদ্রি তাকে এরকম আশ্বাস দিলেও শেষ পর্যন্ত কাজের কাজ হল না কিছুই। ধর্মান্তরিত হয়ে শুধু সে তার পিতৃ-নির্বাচিত পাত্রীকে বিয়ে করাটা আটকাতে পারল।

খ্রিস্টান হবার পর মধুর আর বাড়িতে ফেরার পথ রইল না। হিন্দু কলেজ থেকে নাম কাটা গেল।

কিন্তু পড়াশুনো করার তীব্র বাসনা তার মনে। সে বিশ্বের জ্ঞান ভাণ্ডারের সন্ধান পেয়ে গেছে। এখন তার ভেতর প্রবেশ না করে সাধারণ মানুষের মতন জীবন কাটাতে পারবে না।

সে ভর্তি হয়ে গেল বিশপস কলেজে, যেখানে খ্রিস্টান ছাত্র ছাড়া আর কেউ পড়তে পারে না। এবং সেইসব ছাত্ররাই পরবর্তীকালে খ্রিস্টধর্মের প্রচারক হয়। মধু সেখানে আশ্রয় পেল হোস্টেলে।

মধু গৃহত্যাগ আর ধর্ম ত্যাগ করায় তার মা কেঁদে কেঁদে প্রায় অন্ধের মতন অবস্থা। এই একমাত্র পুত্রের ওপর কত আশা ভরসা ছিল। অন্য ছেলে দুটি মরে গেছে। আর এ ছেলে বেঁচে থেকেও পর হয়ে গেল।

রাজনারায়ণ আর ছেলের মুখ দেখবেন না ঠিক করেছিলেন। মধুও তাঁর সামনে যেতে ভয় পেলেও দেখা করতে লাগল মায়ের সঙ্গে। মায়ের কাছ থেকে টাকা পয়সা চেয়ে আনে।

কয়েকমাস পরে রাজনারায়ণ তা টের পেয়ে গেলেও বাধা দিলেন না। তাঁর মনটা এর মধ্যে নরম হয়েছে। বিশপস কলেজে ছেলের পড়ার খরচ দিতেও রাজি হয়ে গেলেন তিনি।

কিছুদিনের জন্য নব্য বঙ্গীয় যুবকরা হুজুগে পড়ে দলে দলে খ্রিস্টান হয়ে যাচ্ছিল বটে, তাদের মধ্যে কেউ কেউ আবার প্রায়শ্চিত্ত করে ফিরে আসছে বাপ-ঠাকুর্দার ধর্মে, ফিরে আসছে বাড়িতে।

রাজনারায়ণ সে রকম আশা করছিলেন। কিন্তু বছর দুয়েক কেটে যাবার পরেও মধুর মতিগতি পরিবর্তনের কোনও চিহ্ন দেখা গেল না। সে ধর্ম প্রচারক হবার জন্যই প্রস্তুত হচ্ছে।

রাজনারায়ণ আবার ক্ষেপে উঠলেন। মধু কিছুতেই তার কথা শুনবে না দেখে তিনি মাসোহারা বন্ধ করে দিলেন। এবার তিনি মধুকে ত্যাজ্যপুত্র করবেন। শুধু তাই নয়, হঠাৎ সাগরদাঁড়ি গিয়ে তিনি নিজেই বিয়ে করে আনলেন একটি অল্প বয়েসি, সুন্দরী কন্যাকে। এই দ্বিতীয় স্ত্রীর গর্ভে তার সন্তান জন্মালে সেই হবে তার বংশের উত্তরাধিকারী।

মাসোহারা বন্ধ হওয়ায় মধু অকুল পাথারে পড়ল। ফি দিতেও পারল না। তাই বিশপস কলেজে তার শেষ পরীক্ষাও দেওয়া হল না। এখন তার চলবে কী করে? সে তো কখনও উপার্জনের কথা ভাবেনি। কোলকাতা শহরে সে দারুণ বাবুয়ানি করে কাটিয়েছে, এখানে দীনহীনের মতন থাকা তার পক্ষে সম্ভব নয়। বন্ধুদের কাছে থেকে দয়ার দানও সে নিতে পারবে না। তাকে চলে যেতে হবে অনেক দূরে।

মধু এখানকার সহপাঠীদের মধ্যে কয়েকজন ছিল দক্ষিণ ভারতীয়। একটি ইংরেজ ছাত্রের বাবা মাদ্রাজে উচ্চ চাকরি করেন। সেই বন্ধুটি বলেছিল, মধু যদি কোনওক্রমে মাদ্রাজে পৌঁছাতে পারে, তাহলে তার বাবা কিছু না কিছু চাকরির ব্যবস্থা করে দিতে পারবেন।

সেই ঝুঁকি নিতে মধু ইতস্তত করল না। স্বভাবে সে বেপরোয়া, ভবিষ্যৎ মেপে মেপে সে পা ফেলতে জানে না। সে তার বইপত্র, দামি পোশাক ও সৌখিন জিনিসপত্র সব বিক্রি করে দিয়ে, কোলকাতার কারোকে কিছু না জানিয়ে একটা টিকিট কেটে চেপে বসল মাদ্রাজগামী জাহাজে।

এই প্রথম মধুর সমুদ্র যাত্রা। কিন্তু এ জাহাজ তার স্বপ্নের দেশে যাবে না, চলেছে মাদ্রাজের মতন একটা অনুন্নত ক্ষুদ্র শহরের দিকে, অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে।

মাদ্রাজ পৌঁছে মধু ব্ল্যাক টাউনে একটা ঘর ভাড়া নিল। কিন্তু এখানেও চাকরি পাওয়া সহজ হল না। চাকরির ক্ষেত্রই খুব কম। ভবিষ্যতে যে ইংরেজি ভাষায় মহাকবি হবে বলে ঠিক করেছে, সে তো কোনও সওদাগরি অফিসে কেরানির কাজ নিতে পারে না।

কয়েকমাস পরে, তার টাকা পয়সা যখন প্রায় ফুরিয়ে এসেছে, তখন সেই বন্ধুটির বাবার দাক্ষিণ্যে কোনওক্রমে একটা কাজ পেয়ে গেল। তাও অতি সামান্য চাকরি। একটা অনাথ আশ্রমের বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক। বেতন মাত্র ছেচল্লিশ টাকা।

এতদিনে মধু টের পেয়েছে, কত ধানে কত চাল হয়। এই ছেচল্লিশ টাকার তার ঘর ভাড়া ও খাওয়া-পরা চালাতে হবে। এরকম যারা একা থাকে, তারা অনেকেই নিজে রান্না করে খায়, তাতে খরচ বাঁচে।

কিন্তু মধু করবে রান্না ? কী করে ডিম সিদ্ধ করতে হয়, তাই-ই সে জানে না। এতকাল সে দু-তিন মাসের বেশি এক জুতো পরেনি। এক জোড়া জুতো পুরোনো হবার আগেই তার নতুন জুতো লাগত। এক জোড়া নয়, এরকম দশ-বারো জোড়া। এখন তাকে পুরোনো জুতো তাপ্পি দিয়ে পরতে হয়।

অথচ তাকে মেলামেশা করতে হয় সাহেব-সুবোদের সঙ্গে। এখানে তাকে মধু নামে ডাকবার কেউ নেই, সে মাইকেল এম এস ডাট কিংবা শুধু মাইকেল ডাট। তার মুখের ভাষা শুধু ইংরেজি। কিন্তু যতই সে ইংরেজি বলুক আর শার্ট-প্যান্ট পরে সাহেব সাজুক, তার গায়ের রং কালো। ইংরেজদের চেয়ে ভাল ইংরেজি লিখেও সে ইংরেজদের সমকক্ষ হতে পারবে না। ধর্ম পরিবর্তন করে সে রাজার ধর্ম নিলেও থেকে যাবে পরাধীন ভারতীয়। ইংরেজরা তাকে বলে, নেটিভ জেন্টলম্যান।

সাধারণ মানুষের মতন ধরাবাঁধা জীবন কাটাতে চায়নি মধু, কিন্তু একটি অনাথ আশ্রমের বিদ্যালয়ের সহ-শিক্ষকের জীবনে কী আর বৈচিত্র থাকতে পারে ? সে মাঝে মাঝে ইংরেজি পত্র-পত্রিকায় দুটো একটা কবিতা লিখে পাঠায়। তাও ছদ্মনামে। নেটিভ দেখলে যদি ছাপতে না চায়।

স্কুল থেকে বাড়ি ফিরে মধু নিজের খাটটায় শুয়ে থাকে। বিকেল শেষ করে অন্ধকার নেমে আসে, তবু তার বাতি জ্বালাতে ইচ্ছে করে না। তার জীবনটাই যেন তলিয়ে যাচ্ছে অন্ধকারে।

হঠাৎ একদিন এই অন্ধকারের মধ্যে এল এক ঝলক আলো।

অনাথ আশ্রমটির দুটি ভাগ, ছেলেদের ও মেয়েদের জন্য। আলাদা, কিন্তু বিদ্যালয় একটিই। ছেলেমেয়েরা পড়ে একসঙ্গে। মধুই একমাত্র শিক্ষক। বেশি বেতন দিতে হবে বলে তাকে প্রধান শিক্ষকের পদ দেওয়া হয়নি। সে পদ পেতে পারে শুধু কোনও ইংরেজ। মাথার ওপর আর কেউ না থাকলেও মধু সহকারী।

মাইনে কম পেলেও মধু পড়ায় খুব মন দিয়ে। পাঠ্য বিষয় প্রধানত বাইবেল ও তার ইতিহাস। এবং কিছু কিছু ইংরেজি সাহিত্য। মধু এখন প্রায় বাইবেল বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠেছে।

পড়াতে পড়াতে মধু একদিন খেয়াল করল, তার ছাত্রীদের মধ্যে বিশেষ একটি মেয়ে সব সময় তার দিকে এক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে, যেন কিছু বলতে চায়, বলে না। দৃষ্টি দিয়ে তাকে অনুসরণ করে।

মেয়েটি শ্বেতাঙ্গিনী তো বটেই, তার চক্ষু দুটি নীল, যেন দু-চামচ সমুদ্রের জল। তার নাম রেবেকা, সতেরো বছর বয়েস।

পড়তে পড়তে মধু তার দিকে তাকালে সে চোখ সরিয়ে নেয়।

একদিন মধু তাকে জিজ্ঞেস করল ক্লাসের বাইরে এসে, তুমি কি আমাকে কিছু বলবে ?

মেয়েটি লজ্জারুণ মুখে বলল, না,

এই না -এর অর্থ, তার অনেক কিছুই বলার আছে, সে ভাষা খুঁজে পাচ্ছে না।

মধুর বুকটা ধক করে উঠল।

এ মেয়েটি শুধু তার পড়ানো শুনেই মুগ্ধ নয়, তার প্রতি ব্যক্তিগত ভাবেও কি আকৃষ্ট ?

পঁচিশ বছর বয়সে মধুর জীবনে এল প্রেম।

এবং সে প্রেম এল উদ্দাম বন্যার মতন। এখন সর্বক্ষণ সে রেবেকার চিন্তায় ডুবে থাকে।

রেবেকাও একটু সুযোগ পেলেই মধুর সঙ্গে দেখা করতে চায় আড়ালে।

শুধু প্রেম নয়, এর মধ্যে জয়ের আনন্দও আছে। এক নীল নয়না শ্বেতাঙ্গিনীকেই সে একদিন বিয়ে করবে, মধুর এরকম গোপন স্বপ্ন ছিল, সেই স্বপ্ন এখন সত্যি হতে চলেছে।

মধু বিয়ের প্রস্তাব দিতেই রাজি হয়ে গেল রেবেকা। মধুর গায়ের রং কালো, অবস্থাও অতি সামান্য তাতেও রেবেকার আপত্তি নেই, এ যে একজন কবি।

কিন্তু দুজন নারী-পুরুষ ভালবাসলেই যদি তাদের মিলন সম্ভব হত তাহলে এ পৃথিবী অনেক সুন্দর, পবিত্র হতে পারত। কিন্তু তা তো অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হবার নয়, এ পৃথিবী অতি নিষ্ঠুর। ভালবাসাকেই অনেকে পাপ মনে করে। যাদের হৃদয়ে প্রেম নেই, তারা অন্যের প্রেম সহ্য করতে পারে না।

এ বিষয়ে সম্ভাবনা কথা জানাজানি হতেই ক্ষেপে উঠল শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায়ের বড় একটি অংশ।

অনাথিনী হোক বা যাই-ই হোক, ইংরেজ মেয়ে তো। তাকে বিয়ে করবে একটা নেটিভ ? এ কিছুতেই হতে দেওয়া যায় না।

ইংরেজরা এদেশে আসবার পর নিজের জাতের মেয়েদের তো বেশি পায়নি। তাই অনেকেই নারী সঙ্গ ক্ষুধায় দেশি মেয়েদের রক্ষিতা রেখেছে। কেউ কেউ সেই রক্ষিতাকে বিয়ে করে স্ত্রীর সম্মান দিয়েছে। কিন্তু কোনও ইংরেজ রমণীকে এ দেশের কোনও পুরুষ জীবনসঙ্গিনী করেছে এরকম ঘটনা এদেশে কখনও ঘটেনি। অন্য যে কোনও জাতের মেয়েকে ধরে এনে নিজেদের পরিবারভুক্ত করা যায়। কিন্তু নিজের বংশের মেয়েকে কোনও বিজাতীয় পুরুষে হাতে দেবার প্রশ্নই ওঠে না। এটা মান-সম্মানের প্রশ্ন।

ভারতে আগে যা ঘটেনি, মধু তা করতে চাইছে ? বামন হয়ে চাঁদে হাত দেবার শখ।

এ বিয়ে হতেই পারে না। মধু যদি বাড়াবাড়ি করে, তার মাস্টারির চাকরি যাবে। ছাত্রীর সঙ্গে প্রেম করাটাই তো যথেষ্ট অপরাধ। তাকে বিতাড়িত করারও কথা উঠেছে। আরও গুরুতর কিছু ঘটাও বিচিত্র নয়। স্কুল কয়েকদিনের জন্য বন্ধ। রেবেকার সঙ্গে দেখা করারও কোনও উপায় নেই। মধু দারুণ মন-মরা হয়ে আছে। তার সামনে গভীর সঙ্কট। এখান থেকে তাকে চলে যেতে হবে ? রেবেকাকে ছেড়ে ?

দুপুর বেলা হোটেল থেকে খেয়ে ফিরছে মধু। নিজের বাড়িতে গিয়ে ঘুমোবে, না সমুদ্রের ধারে গিয়ে বসবে, ঠিক করতে পারছে না। হঠাৎ বৃষ্টি এসে গেল।

মধু দৌড়ে গিয়ে দাঁড়াল রাস্তার ধারে একটা গাছ তলায়। ঠিক সেই সময় যদি বৃষ্টি না নামত, সেই বিশেষ গাছটার তলায় গিয়ে মধু আশ্রয় না নিত, তাহলে হয়তো পরবর্তী ঘটনাগুলো ঘটত না। তা হলে তার জীবনটাও অন্য রকম হত।

এই গাছতলায় একটা লোক শুয়ে থাকছে কয়েকদিন ধরে। মাঝে মাঝে তাকে ঘিরে বসে কয়েকজন লোক। যাওয়া আসার পথে মধুর চোখে পড়েছে, সে মন দেয়নি।

সিগারেট নামে জিনিসটি সদ্য চালু হয়েছে এ দেশে। মধুর বরাবর ধূমপানের নেশা, খরচ একটু বেশি হলেও সে সিগারেট টানা ধরেছে। সিগারেটের আগুন জ্বালতে গিয়ে তার হাত থেকে দেশলাইটা পড়ে গেল শুয়ে থাকা মানুষটার একেবারে মুখের সামনে। মধু নিচু হয়ে দেশলাইটা তুলতে যেতেই সেই মানুষটি ধড়মড় করে উঠে বসে পরিষ্কার বাংলায় বলল, মধু না ? মধু, মধু ? এখানে বাঙালিই নেই, আর মধু বলে কে ডাকবে ? এই পাগলের মতন চেহারার পথের মানুষটি মুখে মধু বাংলায় নিজের নাম শুনে বিস্মিত হবার বদলে বিরক্ত হয়ে বলল, হু দা হেল আর ইউ ?

লোকটি একগাল হেসে বলল, তুই আর আমায় চিনবি কী করে ? যা চেহারা করেছি। আমি তোর ছোটাইদাদু রে মধু। আমাকে মনে নেই।

মধু এক দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে বলল, ছোটাই দাদু।

মানিকরাম বললেন, হ্যাঁরে। তোকে যে এখানে দেখতে পাব, প্রথমে তোকে চিনতে পেরেও বিশ্বাস করতে পারিনি।

মধু জিজ্ঞেস করল, ছোটাই দাদু, তুমি এখানে কী করে এলে ?

মানিক বললেন, কী করে এসেছি জানি না। আমার কোনও জায়গা নেই রে। যখন যেদিকে চোখ টানে সে দিকে যাই। আমার নিয়তি আমাকে নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাচ্ছে। যেদিন শেষ নিশ্বাস পড়বে, তার আগে আমার এই চলা থামবে না। তুই এখানে কী করিস ?

চাকরি করি।

এই দূর বিদেশে। তোর আবার চাকরির কী দরকার ?

তোমারই মতন আমার নিয়তিই বোধহয় আমাকে টেনে এনেছে এখানে। আবার কোথায় নিয়ে যাবে জানি না।

তোকে কত ছোট দেখেছি। কত বছর আগে দেশ ছেড়েছি তাও মনে নেই। বাড়ির কার কী খবর, কিছুই জানি না।

তোমার খবরও কেউ জানে না ছোটাই দাদু।

মাঝে মাঝে মনে পড়ে আমাদের সাগরদাঁড়ি গ্রামটার কথা। সব মানুষ, আমার গানে দল। তোর মনে আছে মধু ?

মধু একটু চুপ করে রইল। ভুলে যেতে সে চেয়েছিল, তবু তো মনে আছে সব। সেই গ্রাম, সেই কপোতাক্ষ নদী, একদিন সেই নদীতে নৌকো নিয়ে দূরে মিলিয়ে গিয়েছিল সেই ছোটাই দাদু। বাংলা কথাও সে বলেনি কতদিন। তবু, ছেলেবেলার এই প্রিয় মানুষটিকে দেখে সে তো ঝরঝর করে বলতে পারছে বাংলা।

মানিকরাম বললেন, তোকে রামায়ণ-মহাভারত মুখস্ত করাতাম। মনে আসে সে সব ?

মধু বলতে লাগল :

প্রভাত হইল নিশা উদিত মিহির।
চলিলেন দুই ভাই চম্পা নদী তীর।।
কেলি করে নানা পক্ষি পক্ষিনী সহিত।
দেখিলেন মৃগ মৃগী বিচ্ছেদ বঞ্চিত।।
রাজহংস রাজহংসি ক্রীড়া করে জলে।
দেখিয়া রামের শোক সাগর উথলে।। ...

পরম আহ্লাদে মানিকরাম চেঁচিয়ে উঠলেন, বাঃ বাঃ, এমন তো আমারও স্মরণে নেই রে। তুই কোট-প্যান্টুল পরা সাহেব সেজে এসব মনে রেখেছিস। বড় আনন্দ হল, বড় আনন্দ হল। তুই কেমন আছিস রে মধু ? বিয়ে করেছিস ? বৌমা কোথায় ?

মধু ফ্যাকাসে গলায় বলল, আমি এখানে একাই থাকি। ভাল আছি। ভাল আছি।

মানিকরাম বললেন, মধু, আমি সাধুর ভেক ধরেছি, প্রকৃত সাধু আর হতে পারলাম কই। তবে, মানুষের মুখ দেখে তার ভেতরটা কিছুটা বুঝতে পারি। তুই তো ভাল নেই রে। তোর কী হয়েছে। আমায় বল। বোস, বোস, এইখানে বোস।

বিনা দ্বিধায় সেই পথের ধুলোয়র মধ্যে মধু বসে পড়ল মানিকরামের পাশে।

যেন খুলে গেল তার মনের বন্ধ দ্বার। এখানে তার সেরকম কোনও বন্ধু নেই। কারুকে বলতে পারেনি। আজ সে বার বার করে বলে যেতে লাগল সব কথা। একজন কারুকে তো বলতে হবে।

সব শুনে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন মানিকরাম।

তারপর বললেন, জাতের তফাত, তাই মিলন হয় ন। ধর্মের তফাত, মিলন হয় না। সাদা চামড়া, কালো চামড়া, মিলন হয় না। তবুও, দুই জাতের দুই ধর্মের দুরকমের চামড়ার নারী-পুরুষদের মধ্যে এমন ভালবাসা হয় কেন ? এ কী রকম ভগবানের বিধান ? সারা জীবন এর উত্তর খুঁজে পেলাম না রে মধু। নিজের জীবন দিয়ে আমি বুঝেছি, আর সব কিছু চাপা দেওয়া যায়, আর সব কিছু ভোলা যায়, দাবানলও নিভিয়ে ফেলা যায়, কিন্তু ভালবাসার আগুন নেভে না। অচরিতার্থ ভালবাসা মানুষকে শুধু পোড়ায়। বুকটা ছারখার করে দেয়, তার কোনও কিছুর, এমনকী অমৃতেও আকাঙ্ক্ষা থাকে না। তুই ভালবেসেছিস মধু, জীবনটা নষ্ট করিস না। সব সাদা চামড়ার লোকগুলোই তোর বিপক্ষে ? কেউ তোর দিকে সায় দেয়নি ?

মধু বলল, তা আছে কয়েকজন। কিন্তু তারা প্রকাশ্যে কিছু বলতে সাহস পায় না।

মানিকরাম বললেন, আমি ভুল করেছিলাম। আমি নিজের ইচ্ছের জোর খাটাতে পারিনি। আমার পক্ষে একজনও ছিল না। আসলে তখন বুঝিইনি ভালবাসা মানুষের বুকের কতখানি দখল করতে পারে। তা বুঝতে বুঝতেই এতদিন কেটে গেল। মধু, আমার গা ছুঁয়ে দ্যাখ তো, আমি বেঁচে আছি, না মরে গেছি ?

মধু চমকে উঠে বলল, কী বলছ, ছোটাই দাদু।

মানিকরাম অপলক দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে থেকে বললেন, সত্যিই এখন আমি মরা আর বাঁচার মধ্যে পার্থক্য বুঝি না। কুলসম চলে যাবার পর মাঝে মাঝেই মনে হয়, আমার শরীরটা নেই, ক্ষুধা-তৃষ্ণা নেই, আমি মাটিতে আছি, না বাতাসে আছি জানি না। তুই দ্যাখ না ভাল করে, আমি কি এখানে আছি, না নেই ?

মধু বলল, এই তো তুমি আছ।

মানিকরাম বললেন, কী জানি। তা হলে এখন যাই ?

কোথায় যাবে ?

কী জানি। এখানে বোধহয় এসে পড়েছিলাম তোরই টানে। মধু, ভালবাসার জন্য জীবনটা বাজি ধরা যায়। টাকা-পয়সা, মান-সম্মান এসব কিছুই কিছু নয়। পরে কী হবে তা ভেবে লাভ নেই।

মানিকরাম উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর পোশাক শতছিন্ন। কম্বলটা ধুলোয় মাখামাখি। মধুর কাঁধে একটা হাত রেখে প্রশান্ত গলায় বললেন, আর আমার কষ্ট হয় না। কুলসম আমাকে মুক্তি দিয়ে গেল। তোর থেকে আমি ভাল আছি রে মধু।

এরপর মধুর অনেক অনুরোধেও মানিকরাম তার ঘরে যেতে চাইলেন না। আস্তে আস্তে হেঁটে গেলেন সমুদ্রের দিকে। এর তিনদিন পরেই রেবেকার সঙ্গে পরিণয় অনুষ্ঠান হয়ে গেল মাইকেল এম এস ডাটের। এক ফিরিঙ্গি দম্পতি ও আর একজন বন্ধুর সাহায্য নিয়ে খুব চুপি চুপি সে অনুষ্ঠান সারা হল। তার বিরুদ্ধ পক্ষরা কোনও খবরই পেল না। দারুণ বৃষ্টিও পড়েছিল সেদিন, অনেকেই বাড়ি থেকে বের হয়নি।

গির্জার খাতায় নাম লিখিয়ে মধু যখন রেবেকার হাত ধরে এগিয়ে যাচ্ছে পাদ্রির দিকে শপথ উচ্চারণের জন্য হঠাৎ তার চোখ পড়ল জানালার বাইরে।

পথের ওপাশে দাঁড়িয়ে আছেন মানিকরাম।

সারাটা জীবন যে মানুষটা সব কিছু থেকে বঞ্চিত হয়ে রইলেন, তার মুখমণ্ডলে এখন ফুটে উঠেছে অপরূপ তৃপ্তির হাসি।